সচিত্র

বসন্ত-লতা।

(অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক উপন্যাস)

মল্লীকপুর নিবাসী

বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন

প্রণীত।

(১১২ নং চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে)

শ্রীসীতারাম দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

হিন্দু প্রেস,

৬২ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

শ্রীহরিদাস দে দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০২ সাল।

সচিত্র

বসন্ত-লতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নবীনহৃদয়ে চিন্তাকীট।

বর্ষাকাল;—শ্রাবণ মাস। ধারার বিরাম নাই!—কখন বেশী, কখন বা কিঞ্চিৎ কম। খাল, বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতি নবীনজলে পরিপূর্ণ। ভেককুলের গভীরনাদে চতুর্দ্দিক প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। কীট পতঙ্গেরা এক প্রকার অস্ফুট মধুরধ্বনি করিয়া দিঙ্মণ্ডল মাতাইয়া তুলিতেছে। বিবিধ শব্দপুঞ্জ একত্র হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, যাত্রার দলের আসর জমকিয়া উঠিতেছে।

ক্রমে বেলা অবসান হইল। সরোজিনী বিষাদিনী হইয়া ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। গভীরনাদে আবার বৃষ্টিবর্ষণ হইতে লাগিল। খদ্যোতিকারা উড়িতে উড়িতে বৃক্ষের ডালে ডালে—পাতায় পাতায় ভ্রমণ করিতে লাগিল;

বোধ হইতে লাগিল যেন, বৃক্ষশিখরে শত শত হীরকখণ্ড শোভা পাইতেছে। ঘোরা তামসী রজনীতে এরূপ শোভা ভাবুকের নয়নে যার পর নাই প্রীতিকর।

কালের গতি বিচিত্র! কালবশে মানবের অদৃষ্টে কখন্ যে কি অবস্থা ঘটে, তাহা কে বলিতে পারে? কালবশেই মানবের মন বিচলিত হয়, আলোড়িত হয়, ভাবনায় আকুল হইয়া উঠে। কালবশেই মানবের মন অনন্ত-ক্ষোভসাগরে নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছে, আবার কালবশেই সে সমস্ত ভুলিয়া অতুলনীয় সুখহ্রদে সন্তরণ করিতেছে।

সকলই ঈশ্বরের লীলা। কেহই তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা করিতে সমর্থ হয় না। বালকেরা যেরূপ পুত্তলি প্রভৃতি লইয়া ক্রীড়া করে, জগৎপাতা সর্ব্বেশ্বরও সেইরূপ এই লোকজগৎ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। তিনি কাহাকেও উত্তাল আনন্দ-তরঙ্গে নাচাইয়া নাচাইয়া সুখময় সলিলে নিক্ষেপ করিতেছেন, আবার কাহাকেও বা অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া দিবা-নিশি কান্দাইতেছেন। কাহারও পরিচর্য্যার নিমিত্ত শত শত দাস-দাসী প্রতিনিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছে, আবার কাহাকেও সমস্ত দিন নিদারুণ পরিশ্রম করিয়া অনাহারে জীবন যাপন করিতে হইতেছে।

আহা! ঐ দেখ, একটী অষ্টাদশবর্ষীয় সুন্দরকান্তি নবযুবা করতলে কপোলবিন্যাস পূর্ব্বক অধোবদনে কি চিন্তা করি-তেছেন। যুবার বদনকমল বিষাদ কালিমায় একান্ত মলিন। এ নবীন বয়সে এত চিন্তা কেন? কোমল হৃদয়ে বিষাদশেল নিক্ষেপ করিতে কি হতবিধির অন্তরে বিন্দুমাত্রও করুণা সঞ্চার হয় নাই? ধন্য বিধে তোমার অন্তর!—ধন্য তোমার লীলা!

রাজনগর একখানি গণ্ডগ্রাম!—বর্দ্ধমানের অন্তর্ভূক্ত। গ্রামখানির দৃশ্যসৌষ্ঠব নিতান্ত মন্দ নহে। অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোকের বাস। হরিহর মুখোপাধ্যায় গ্রামের মধ্যে একজন মান্য গণ্য ব্যক্তি।—সামাজিকে একদলের দলপতি। দেশহিতৈষিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণে তিনি কি শত্রু, কি মিত্র সকলের নিকটেই প্রতিষ্ঠাভাজন ছিলেন। সন ১২৭২ সালের দুর্ভিক্ষে যখন মহামারী উপস্থিত হয়, সেই সময়ে অকস্মাৎ একদিবসেই হরি বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র,—নাম নীরদচরণ। নীরদের বিবাহের দুই তিন বৎসর পরেই হরিহরের মৃত্যু হয়। সেই জন্যই পিতৃ-মাতৃ-শোকে বিহ্বল হইয়া নীরদ একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। চিন্তাগুণে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। কিরূপে মানসম্ভ্রম বজায় থাকিবে, কিরূপে সংসার চলিবে, নবীনহৃদয়ে এই সকল চিন্তার সমাকুল। পিতামাতার মৃত্যুর পর দেখিতে দেখিতে তিন মাস অতীত হইল, তথাপি চিন্তার বিরাম নাই। দিন দিন নীরদের দেহ জীর্ণ-শীর্ণ হইতে লাগিল।

তরুণবয়স্কা হইলেও নীরদের সহধর্ম্মিণী বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও সংসার-ধর্ম্মের কৌশল দেখিয়া প্রতিবাসিনী রমণীরা তাঁহাকে নারীর আদর্শ করিয়াছিল। তিনি পতিকে দিন দিন ম্লান হইতে দেখিয়া নানারূপ প্রবোধবচনে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সংসারের গতি চিরদিনই এইভাবে চলিতেছে, এইরূপ প্রবোধ দিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে যত্নবতী হইলেন। প্রিয়তমার অমিয়বচনে—যত্নে ও শুশ্রূষায় নীরদের হৃদয় ক্রমে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে পিতামাতার শোক

ভুলিলেন।—সংসার মায়ায়—মোহমায়াপাশে বদ্ধ হইতে লাগিলেন। যে আশাতরী অবলম্বন করিয়া মানবসংসার চক্রাকারে ঘুরিতেছে, সেই আশা আসিয়া নীরদকে আশা দিতে লাগিল। তাঁহার মনে মনে এই আশা হইতে লাগিল যে, সহধর্ম্মিণীর গর্ভে সন্তানসন্ততি জন্মিলে তিনি প্রকৃত সুখী হইতে পারিবেন।

সুখ-দুঃখ নিরন্তর চক্রবৎ বিঘূর্ণিত হইতেছে। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, এই নিয়মেই সংসার চলিয়া আসিতেছে। মনুষ্যের দুঃখের অবসান হইলেই সুখের দশা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সময়ে কত লোকজন—দাসদাসী আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু সেই দশা যদি চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলে যে কি সুখের হইত, তাহা কে বলিয়া শেষ করিতে পারে? ঈশ্বরের অনন্ত লীলার মর্ম্মোদ্ভেদ করে, কাহার সাধ্য? এইরূপে সংসারচক্রের সুখের সম্পূর্ণ সাধ মিটিতে না মিটিতেই অশেষ প্রকার দুঃখ আসিয়া আক্রমণ করে। নীরদ সংসারচক্রের এইরূপ ভাবান্তর ভাবিয়া ভাবিয়া কোনরূপে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার নবীন হৃদয়ে চিন্তাকীট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, কালের গতি অতীব কুটিল।
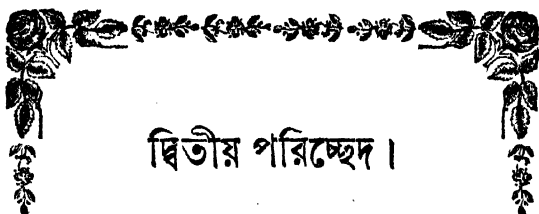
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশা।

রাজনগরের নিকটেই একটী হাট। একটী মাঠ ও একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পার হইয়া হাটে যাইতে হয়। নদীতে একখানি নৌকা আছে, দুইটী নাবিক পথিকদিগকে পারাপার করিয়া দেয়। নদীটী প্রকৃত নদী নহে,—শাখা নদী। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে এরূপ শুষ্ক হইয়া যায় যে, নদীগর্ভে গরু-মেষ প্রভৃতি অবহেলে পরিভ্রমণ করে; কিন্তু বর্ষাকালে অসীম জলরাশি আসিয়া নদীকে বৃহদাকারে পরিণত করিয়া দেয়।

আজি হাটবার। বুধবার ও শনিবারেই রাজনগরের হাট হইয়া থাকে। কত লোক হাটে যাইতেছে,—ছুটাছুটি করিতেছে,—গলদঘর্ম্মে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। কেহ থলিয়া—কেহ চাঙ্গারী—কেহ বা দুর্ব্বহ বোঝা লইয়া গমন করিতেছে। পল্লীগ্রামের এই শোভাই একরূপ নয়নের প্রীতিকর। কত যুবক-যুবতী জিনিস খরিদের জন্য মনের সাধে অগ্রসর হইতেছে। গরিবদুঃখীর ঘরের স্ত্রীলোকেরা পরিষ্কার শাড়ী

পরিয়া তাম্বুলরাগে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করতঃ মন্থরগতিতে যাই-তেছে। কেহ বা হাস্য করিয়া অপরের ঘাড়ে গড়াইয়া পড়িতেছে, কেহ বা নানারূপ ভঙ্গী করতঃ যুবকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

আজি কালি সহরের কথা দূরে থাকুক্, পল্লীগ্রামের নব্যবাবুদের মধ্যে টেরিকাটার ধুম বেশী। গৃহে অন্ন নাই, কিন্তু চীনেরবাড়ীর জুতা—কালাপেড়ে ধুতি এবং রংদারী একখানি গাম্ছা চাই-ই চাই। রংদারী গাম্ছা স্কন্ধে ফেলিলেই যেন তিনি একটী পল্লীগ্রামের মুরোদ বাবু হইলেন। এই রকমের কতকগুলি বাবু আহারাদি করিয়া হাটের দিকে অগ্রসর হইল। বাটীর বাহির হইয়াই মুখে মূর্ত্তিমান রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি। থিয়েটারের সুরে গান গাইতে গাইতে কত রকম তালফের্তা—সুরফের্তা কায়দা দেখাইতে লাগিল যে, তাহা শুনিলে হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না।

বাবুরা হাটে যাইবার সময় রসিকতার চূড়ান্ত দেখাইতে লাগিলেন। কাহাকেও তামাসা করিতেছেন, কাহাকেও মুখভঙ্গী করিতেছেন, কাহারও সঙ্গে বা দুইটী রসিকতার কথা বলিয়া আবার সরিয়া পড়িতেছেন। ফল কথা, ভবের হাটে যে কত রকম লোক আছে, পল্লীগ্রামে তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়।

হীরার মাও একটী ক্ষুদ্র চুপড়ী হস্তে করিয়া হাটের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। হীরার মা এক প্রকার সে-কেলে লোক ;—সে ফের-ফন্দী কিছু জানে না। এখনকার নবীনা-সম্প্রদায়ের সহিত তাহার স্বভাবের বিন্দুমাত্রও ঐক্য হয় না। তাহার বয়স অনুমান চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। সে একখানি অর্দ্ধ মলিন শাড়ী পরিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। সে পূর্ব্ব-

কথিত নদী পার হইয়াই দেখিল, অদূরে একটী বৃক্ষমূলে অসংখ্য লোক একত্রিত হইয়া গোলমাল করিতেছে। সে গোলমালের কারণ জানিতে উৎসুক হইয়া দ্রুতপদে সেই-স্থানে উপস্থিত হইল, কিন্তু জনতা ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না, জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন কারণ জানিতে পারিল না, কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। অগত্যা সে ক্ষুণ্ণমনে হাটের দিকে চলিয়া গেল।

ক্রমে দিবা অবসান। হাটের সমস্ত ক্রেতা বিক্রেতারা আপন আপন কাজ শেষ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে লাগিল। হীরার মাও ধীরে ধীরে চুপড়িটী কক্ষে লইয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। হাটে যাইবার সময় সে যে গোলমাল দেখিয়া গিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত তাহা বিস্মৃত হয় নাই। কিসের গোল জানিবার জন্য তাহার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। সে প্রত্যাগমনকালে পুনরায় সেই বৃক্ষতলে আসিয়া দেখিল, আর সেরূপ জনতা নাই, কেবল একটী সন্ন্যাসী নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তখন হীরার মা বুঝিতে পারিল যে, এই সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্যই লোকজনের সেইরূপ ভিড় হইয়াছিল। হীরার মার মনে মনে চিরদিনই এইরূপ বিশ্বাস আছে যে, সন্ন্যাসীদিগের অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। তাঁহারা একটীমাত্র ফু দিয়া সমস্ত রোগ, পীড়া দূর করিয়া দিতে পারেন। কোন পুরুষে যাহার সন্তান-সন্ততি জন্মে না, সন্ন্যাসীর কৃপায় তাদৃশী বন্ধ্যানারীও গর্ভবতী হয়। সন্ন্যাসীরা মনে করিলে রাজ-রাজেশ্বর করিয়া দিতে পারেন। সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, নিকটে চেলাও নাই, সুতরাং হীরার মা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল।

সন্ন্যাসীদের ধ্যানভঙ্গ করিলে বিষম বিপদে পড়িতে হয়, হীরার মা তাহা অবগত ছিল; সুতরাং সে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সন্ন্যাসীর বদনবিবর হইতে গম্ভীরনাদে নির্গত হইল, "শিব শম্ভো!"

হীরার মার মনে এতক্ষণের পর আশার সঞ্চার হইল। তাহার মনের আশা সেই জানে, আর একমাত্র সেই ভগবান্ শম্ভুই বলিতে পারেন। হীরার মা ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর অধিকতর সমীপবর্ত্তী হইল। তখন যোগীবর পুনরায় গম্ভীর-নাদে বলিয়া উঠিলেন, "শিব শম্ভো!"

তখন হীরার মা আর ইতস্ততঃ না করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণি-পাত পূর্ব্বক বলিল, "গোঁসাই বাবা! প্রণাম হই।"

হীরার মার এইরূপ ধারণা যে, সন্ন্যাসীযোগীকে গোঁসাই বাবা বলিয়াই সম্বোধন করিতে হয়। হীরার মার কণ্ঠস্বর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র সন্ন্যাসী নেত্র উন্মীলন করি-লেন;—বলিলেন, "ক্যা মাঙ্‌তা হ্যায়।"

"আমি বুড়ো মানুষ বাবা।"—হীরার মা সন্ন্যাসীর হিন্দি ভাষা ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া উত্তর করিল, "আমি বুড়ো মানুষ বাবা।"

"তোম্ বুড্‌ঢী হো?"

"আমি বুড়ো মানুষ বাবা!"

"আচ্ছা, বুড্‌ঢীমায়ী! তোম্ ক্যা মাঙ্‌তা হ্যায়।"

এবার হীরার মা একটু একটু বুঝিল যে, সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কি চাও?" তখন সে করযোড়ে বলিল, "বাবা! একটী মেয়ের ছেলেপিলে হয় নাই, দয়া কোরে যদি একটু ঔষধ দেন।"

"তেরা মেইয়া?"

"আমি বুঝ্‌তে পারিনি বাবা!"

"যো মেয়ে কি লেড়্‌কা হুয়া নেহি, উ তুহারি মেইয়া?"

"সে ঘয়ে আছে বাবা!" হীরার মা মনে করিল, যার জন্ত ঔষধ প্রার্থনা করা যাইতেছে, সে কোথায়? এই ভাবিয়া বলিল, "সে ঘরে আছে বাবা!"

সন্ন্যাসী এই উত্তর শুনিয়াই কহিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, উস্‌কো সাতকোর্‌কে জল্‌দি হামারা পাস্‌ লে আও!"

হীরার মা আহ্লাদে যেন ফুটিফাটা হইয়া পড়িল। সে অমনি ধূলালুণ্ঠিত হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণামপূর্ব্বক দ্রুতপদে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাড়াতাড়ি নৌকা পার হইবে মনে করিয়া যেমন ঘাটে উপস্থিত হইয়াছে, অমনি দেখিল, তথায় নৌকা বা জনমানবের চিহ্ন নাই। নাবিকেরা পরপারে নৌকা বান্ধিয়া আহারাদি করিতে গিয়াছে। পরপারে ঘাটের উপরেই নাবিকদিগের গৃহ। হীরার মা চীৎকারস্বরে মিনতি করিয়া তাহাদিগকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। হীরার মা দেখিল, বিষম বিভ্রাট। দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইতেছেন। এই সময় পার হইতে না পারিলে অন্ধকারে গৃহে প্রতিগমন করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিবে। সে অনন্যোপায় হইয়া মনে মনে বিপত্তিকাণ্ডারী হরিকে স্মরণ করিতে লাগিল।

সহসা ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দে ইংরাজ বাহাদুরের ডাক আসিয়া উপস্থিত। তদ্দর্শনে হীরার মার মনে আনন্দের সঞ্চার হইল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, এক মনে হরিকে স্মরণ করিয়াছি, সেই হরিই আমার পরপারের কাণ্ডারী জুটাইয়া দিলেন। ডাকবাহক ঘাটে উপস্থিত হইয়াই মুক্তকণ্ঠে

নাবিকদিগকে আহ্বান করিল। নাবিকেরা আর মুহূর্ত্তমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া নৌকা লইয়া আগমন করিলে ডাক-বাহকের সহিত হীরার মা বিনা আপত্তিতে নির্ব্বিঘ্নে পরপারে উত্তীর্ণ হইল।
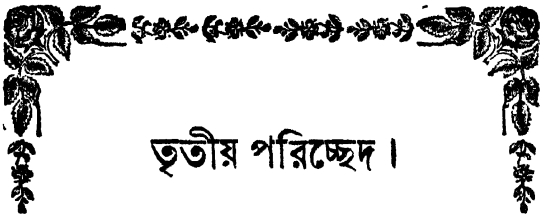
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুসমাচার।

পিতামাতার পরলোকের পর হইতে নীরদচরণ একদিনের জন্যও বাটীর স্থির হন নাই। সর্ব্বদা বাটীতে থাকেন বটে, কিন্তু যেরূপ বিষয়কর্ম্মে যে সেরূপ লিপ্ত থাকেন, তাহাও নহে। তিনি প্রথমতঃ কিয়দ্দিন কেবল চিন্তানিমগ্ন হইয়াই একান্তে অবস্থিত থাকিতেন, কিন্তু কালের গতিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সে ভাব বিদূরিত হইল। যে সংসার অসার বলিয়া এতদিন তাঁহার মনে ধারণা ছিল, এখন তিনি সে সংসারকে যেন প্রকৃত সুখের আগার বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। নবযৌবনের উদয়ই তাঁহার এই ভাবের একমাত্র কারণ সন্দেহ নাই।

আহা! যৌবনের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! কি অলৌকিক শক্তি! এই সময়ে মানবের ইন্দ্রিয়গণ যার পর নাই সতেজ হইয়া উঠে। শত শত যুবক এই যৌবনমদে মত্ত হইয়া নবীনা কামিনীগণের নবীন প্রেমে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পিতৃ-পিতামহদিগের বহুকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থরাশি অকাতরে

জলাঞ্জলি দিতেছে ;—এমন কি প্রেমের দায়ে জীবন উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু আমাদের নীরদচরণ সেরূপ যৌবনমদে উন্মত্ত নহেন। তিনি স্বীয় যুবতী সহধর্ম্মিণীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া সাত্ত্বিকভাবে সেই প্রেম-সুধাপানেই নিমগ্ন হইলেন।

নীরদচরণ যুবক, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও নবযুবতী ; সুতরাং তাঁহাদিগের উভয়ের প্রেমানুরাগ যে কিরূপ বদ্ধমূল হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। নীরদ-চরণ অষ্টাদশবর্ষীয় যুবা এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবকের পক্ষে এরূপ যুবতী ভার্য্যা অসম্ভব বলিয়া যেন পাঠকগণের প্রতীতি না হয়, কারণ আজিকালি বিবাহব্যবস্থা সচরাচর এইরূপই দেখা গিয়া থাকে। স্বামীর বয়ঃক্রম যতই হউক্ না কেন, কন্যাটী বয়স্থা না হইলে কাহারও মনে ধরে না। যাহা হউক, নীরদ বাবু যুবতী নারী লইয়া মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে পাঠকগণের নিকট নীরদ বাবুর বাটীখানির পরিচয় যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া রাখি। পল্লীগ্রামস্থ ভদ্রলোকের বাটীঘর নিতান্ত অপরিষ্কৃত বা মন্দ নহে। নীরদ বাবুর বাটীখানি সুপ্রশস্ত—চতুর্দ্দিকেই প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বাটীর মধ্যে অনেকগুলি ঘর ;—প্রতি ঘরই পরিষ্কাররূপে সুসজ্জিত। প্রতি গৃহই নানাবিধ ছবি—দেয়ালগিরি—টানাপাখা প্রভৃতিতে পরিশোভিত। তন্মধ্যে একখানি গৃহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেই খানিতেই নীরদ বাবু শয়ন করিয়া থাকেন। বাটীতে লোকজন তাদৃশ নাই, সুতরাং অধিকাংশ গৃহগুলিই তালাবদ্ধ থাকে।

নীরদ বাবু তাঁহার শয়নকক্ষে দিব্য শয্যাতলে বসিয়া

আছেন, আর তাঁহার পত্নী পার্শ্বে বসিয়া নানাবিধ কথোপ-কথন ও হাস্য পরিহাস করিতেছেন, ইত্যবসরে সদর দরজায় ধীরে ধীরে কে আঘাত করিল। পরক্ষণেই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, "দাদা বাবু!"

নীরদ বাবু তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া সদর দরজা খুলিলেন;—দেখিলেন, সম্মুখে হীরার মা উপস্থিত। পূর্ব্বদিন হাট হইতে বাটী আসিতে হীরার মার সন্ধ্যা হইয়াছিল, সুতরাং সে দিন আসিতে না পারিয়া তৎপরদিনেই নীরদ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে।

নীরদ বাবুর বাটী হইতে হীরার মার বাড়ী অধিক দূর নহে। সে সর্ব্বদাই নীরদচরণের বাটীতে যাতায়াত করে। বিশেষ নীরদ বাবুর পিতামাতার মৃত্যুর পর হীরার মা প্রত্যহই একবার করিয়া আইসে এবং নীরদ বাবুর সহধর্ম্মিণীর সহিত নানারূপ কথোপকথনে, আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করে। নীরদ বাবু ও তাঁহার পত্নী উভয়েই হীরার মাকে যার পর নাই ভালবাসিয়া থাকেন। হীরার মা হাস্যমুখে অন্দরমহলে গিয়া নীরদ বাবুর পত্নীর নিকট উপস্থিত হইল।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর হইতে কলিযুগ অনেক অন্তর হইয়া পড়িয়াছে। কালের সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখন স্ত্রীলোকেরা আর কাহাকেও লজ্জা করে না, তাহারা লজ্জাকে লজ্জা দিয়া একেবারে স্থানান্তরিত করিয়াছে। আমাদের নীরদচরণের স্ত্রীও সেইরূপ। তিনিও পতির সমক্ষে তাদৃশ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিতে ভালবাসেন না। হীরার মা তাঁহাকে বৌ দিদি বলিয়া ডাকিত। সে অন্দরে আসিয়া বসিবামাত্র তাহার বৌ দিদিও নিকটবর্ত্তী হইল। উভয়ের নানারূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

হীরার মা প্রথমতঃ একটু ভূমিকা করিয়া সন্ন্যাসীর বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। তাহার বৌ দিদি একমনে সমস্ত শ্রবণ করিলেন। তিনি এই সমস্ত বিবরণ পতিকে জানাইবার জন্য হীরার মাকে অনুরোধ করিলেন।

স্বামীর নিকট স্ত্রীর অনুরোধ কদাচ ব্যর্থ হইবার নহে। হীরার মা নীরদ বাবুর নিকট সমস্ত কথা জানাইলে প্রথমতঃ তিনি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সম্মতি প্রদান করিলেন না সত্য, কিন্তু অবশেষে পত্নীর আগ্রহাতিশয় দর্শনে অনুমতি দিতে হইল। বিশেষ মনে মনে ভাবিলেন, যদি যোগীর প্রদত্ত ঔষধে অচিরে শুভ সন্তান জন্মে, তাহা হইলে পরম সুখের বিষয় হইবে। এইরূপ আলোচনা করিয়া হীরার মার সহিত পত্নীকে সন্ন্যাসীর নিকট গমনে অনুমতি দিলেন। হীরার মার আনন্দের সীমা রহিল না, তাহার সুসমাচার এতক্ষণে সফল হইল।
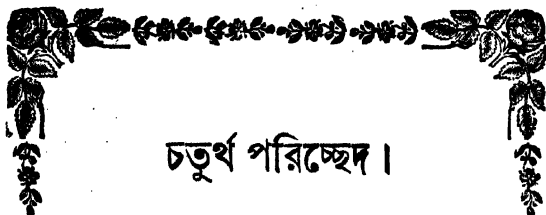
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরমহংসদত্ত বর।

যে নদী পার হইয়া রাজনগরের হাটে যাইতে হয়, মোহনগড় গ্রামের উপর দিয়া সেই নদী বরাবর দক্ষিণাভি-মুখে গমন করিয়াছে। সেই নদী পার হইয়াই হাটের রাস্তা, অন্য পথ আর নাই। নদীর উভয় পার্শ্বে বিবিধ তরুলতাতে সমাকীর্ণ। নদীর ধারে ধারে অনেকগুলি ঘাট, সেই সকল ঘাটে লোকজন স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। যে ঘাটে লোকজন পারাপার হয়, সেই ঘাটের উপর একটী বৃহৎ প্রাচীন বটবৃক্ষ। সেই মহীরুহের চতুর্দ্দিক্ এরূপ সুপ্রশস্তভাবে ইষ্টক দ্বারা বাঁধান যে, তদুপরি বসিয়া পথিকগণ শ্রান্তিদূর করে, এমন কি শয়ন করিয়াও থাকা যায়।

যে জনশূন্য নদীতীরস্থ বটবৃক্ষমূলে রাত্রিকালে জনমানবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, আজি সেইস্থান অসংখ্য অসংখ্য লোকে সমাকীর্ণ। দিবানিশি নানাদেশ হইতে মানব-মণ্ডলী যাতায়াত করিতেছে। এত লোকজনের সমাগম

কেন, পাঠকগণের জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে। হীরার মা যে সন্ন্যাসীর নিকট গমন করিয়াছিল, সেই সন্ন্যাসীই পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া ঘাটের উপরিভাগে আশ্রয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইঁনি পরমহংস। কোন্ তীর্থ হইতে বা কোন্ পর্ব্বতকন্দর হইতে এই পরমহংসের আবির্ভাব হইয়াছে, কেহই তাহার নিগূঢ় কারণ অবগত হইতে পারে না। দেশে দেশে ঘোষণা হইয়াছে যে, পরমহংস ঔষধ দান করিয়া উৎকট উৎকট পীড়ার উপশম করিয়া দিতেছেন এবং তাঁহার কৃপায় অপুত্রানারী পুত্রলাভ করিয়া পরম আনন্দভোগ করিতেছে। পরমহংস কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। কতকগুলি শিষ্য বা চেলা জুটিয়াছে, তাহারা সমাগত লোকের নিকট হইতে পয়সা বা টাকা লইয়া ঔষধ প্রদান করে। তাহারা সকলের নিকট জানায় যে, পরমহংসের অনুমতি অনুসারেই ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু যোগী স্বয়ং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না।

দেখিতে দেখিতে দুই তিন দিন অতিবাহিত হইল। পরমহংসের নিকট উত্তরোত্তর জনতার এরূপ বৃদ্ধি হইয়া উঠিল যে, দুর্ব্বল লোকের প্রবেশের সাধ্য রহিল না। পরমহংসের চেলারা আর এখন কাহাকেও গুরুর নিকটবর্ত্তী হইতে দেয় না। তাহারা আপনারা পয়সা গ্রহণ করে এবং আপনারাই অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে ঔষধ দেয়।

এদিকে শুভদিন স্থির হইল। শুভক্ষণে পুত্রপ্রার্থিনী হইয়া নীরদ বাবুর সহধর্ম্মিণী হীরার মার সঙ্গে পরমহংস সমীপে উপনীত হইলেন। প্রথমতঃ অসম্ভব জনতা দেখিয়া হীরার মার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণে সাহসে ভর

করিয়া বামহস্তে তাহার বৌদিদিকে ধারণপূর্ব্বক একেবারে পরমহংসের নিকটবর্ত্তিনী হইল। চেলারা তাহাকে অনেক নিষেধ করিলেও সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। সে যোগীর পুরোবর্ত্তী হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিনয় নম্রভাবে করযোড়ে কহিল, "গোঁসাই বাবা! আমি আসিয়াছি।"

সন্ন্যাসী নিরুত্তর। তিনি মুদিতনয়নে ধ্যানযোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গভীরনাদে বলিয়া উঠিলেন, "শিব শম্ভো!"

হীরার মা আবার বলিল, "গোঁসাই বাবা! আমি তোমার সেই বুড়ী।—আমি এসেছি।"

"তোম্ কেয়া মাঙ্‌তা হায়?"—সন্ন্যাসী এ যাবৎ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। একদিবস হীরার মার সহিত দুই চারিটী কথামাত্র হইয়াছিল, আর আজি তাঁহার মধুর-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। তিনি হীরার মার কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোম্ কেয়া মাঙ্‌তা হায়?"

হীরার মা আনন্দের ভরে বলিয়া উঠিল, "বাবা! আমাকে ঔষধ দিবেন বোলেছিলেন, আমি তাকে এনেছি।"

"হামারা পাস্ লে আও!"

উত্তর পাইবামাত্র হীরার মা তাহার বৌদিদিকে যোগীর সম্মুখবর্ত্তী করিল। কিন্তু সন্ন্যাসী পুনরায় নিস্তব্ধ!—আবার নয়ন মুদিত করিলেন।

তখন হীরার মা আবার বলিল, "বাবা! আমি এসেছি।"

সন্ন্যাসীর অন্য উত্তর নাই, কেবল বদন-বিবর হইতে বহির্গত হইল, "শিব শম্ভো!"

আবার হীরার মা বলিল, "বাবা! আমি এসেছি।"

"লে আয়া ?"—এইবার সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন;—বলিলেন, "লে আয়া ?"

"আজ্ঞে হাঁ, এই যে এনেছি।"

"আচ্ছা দেখ্‌লাও ?"

অমনি বৌদিদি পুরোবর্ত্তী হইয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন।

তখন যোগীবর উর্দ্ধদৃষ্টিতে রমণীর প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তেরা সুখ বড়া কম্‌তি হায়। আচ্ছা যাও, একঠো ছেলিয়া হোগা।—জল্‌দি চলা যাও!"

হীরার মা তৎক্ষণাৎ তাহার বৌদিদিকে লইয়া জনতার বহির্ভাগে উপস্থিত হইল। অবশেষে সেই নদীতীরে অবগাহন পূর্ব্বক উভয়ে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সকলেরই ধারণা ছিল যে, পরমহংস বা যোগী কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। কিন্তু আজি হীরার মার সহিত কথোপকথন করিতে দেখিয়া সকলেরই অন্তর বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল। এখন হইতেই সকলে তাঁহাকে কথা বলাইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল; সুতরাং যোগীবর একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

একদা রাত্রি প্রভাতে সকলে নদীতীরে গমন পূর্ব্বক দেখিল, বটবৃক্ষমূলে আর সে সন্ন্যাসী নাই। কেবল তদীয় চেলা কয়েকজন উদাসনয়নে—শূন্য হৃদয়ে বসিয়া রহিয়াছে। এতদিন তাহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়া উদর পূর্ণ করিতেছিল, আজি তাহাদিগের সেই আশা সমূলে উচ্ছেদ হইয়া গেল। তাহারা দীনমনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। সেই প্রাচীন বটবৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় জনমানবসমাগমহীন হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল।
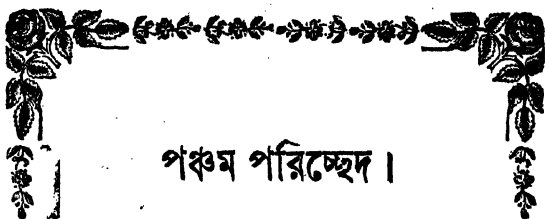
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হীরার মা।

বেলা প্রায় দুই প্রহর। তপনদেব মস্তকের উপরিভাগে থাকিয়া প্রখর কিরণ-জাল বর্ষণ করিতেছেন। রবিতাপে সন্তপ্ত হইয়া বিহঙ্গমগণ মৌনভাবে বৃক্ষ পত্রের অন্তরালে বসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। স্থানে স্থানে পথিমধ্যে যেখানে একবিন্দু ছায়া পড়িয়াছে, কুকুরেরা হাত-পা ছড়াইয়া জিহ্বা বহির্গত করিয়া সেইখানেই শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

হীরার মার কিন্তু বিশ্রাম নাই। এখন গৃহের বাসী-কার্য্যের সময়। সে ঘরগুলি—দাওয়াখানি পরিষ্কার করিয়া পূর্ব্বদিনের উচ্ছিষ্ট তৈজসখানি মাজিতেছে, আর আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকিতেছে। মধ্যে মধ্যে "হরিবোল" "হরি পার কর" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হীরার মা বিলক্ষণ হরিভক্ত,—হরি নিরন্তরই তাহার হৃদয়ে, আর হরিনাম তাহার জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠান করিতেছে।

পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, হীরার মা এত বেলায় প্রাতঃকালীন গৃহকর্ম্ম করিতেছে কেন? সে একাকিনী, তাহার গৃহে ত অন্য কেহ নাই? তবে এত ঝঞ্ঝাট কিসের?—সত্য, তাহার কেহ নাই বটে, কিন্তু সে প্রত্যহ প্রাতঃকালে নীরদ বাবুর বাটীতে গিয়া তাঁহাদিগের কাজ-কর্ম্ম করিয়া দেয়। বৌদিদিকে সে প্রাণের সহিত ভাল-বাসে। পাছে বৌদিদির কষ্ট হয়, পাছে নীরদ বাবুর আহারাদির বিলম্ব হয়, এই জন্যই সে সতত চিন্তাকুল। অপরাপর দিন সে অতি প্রত্যুষে উঠিয়া আপনার গৃহকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক নীরদ বাবুর বাটীতে গিয়া থাকে, কিন্তু আজ কেমন উঠিতে একটু বিলম্ব হওয়াতে তাড়াতাড়ি অগ্রেই বৌদিদির নিকট গিয়াছিল। সেই জন্য আজ এত ঝঞ্ঝাট।

হীরার মার দুইখানি ঘর;—একখানিতে শয়ন করে, অপর খানিতে রন্ধন হয়। দুইখানিই খড়ে ছাউনি আর দরমার বেড়া। বাটীর চতুর্দ্দিকে খেজুর পাতার প্রাচীর, মধ্যে একটী আগড়ওয়ালা দরজা। হীরার মা যখন কোন স্থানে গমন করে, সেই আগড়ে একটী বৃহদাকার তালাবদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। সে জানে যে, সাবধানের বিনাশ নাই। তাহার গৃহে দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে একখানি কাঁথা, একখানি শতগ্রন্থি বহুকালের পুরাতন মলিন লেপ, একটী কাণা ভাঙ্গা বাটী, একখানা পিতলের বেলী থালা, একটী পিতলের ঘটী আর একটী চর্‌কা আছে। এই সমস্ত আস্‌বাবের জন্যই হীরার মার এত সতর্কতা।

হীরার মা কতদিন সধবা ছিল, তাহার পুত্র কি কন্যা কেহ ছিল কি না, তাহা গ্রামের লোক কিছুই বলিতে

পারে না। সুতরাং আমিও পাঠক মহাশয়গণের নিকট সে পরিচয় দিতে অক্ষম। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, সকলেই তাহাকে হীরার মা বলিয়া ডাকে, কাজে কাজেই আমিও সেই নামে পরিচয় দিলাম। ফল কথা,—এখন হীরার মা বিধবা। তাহার উপর কর্তৃত্ব করে, এমন কেহ নাই, সে নিজেই এখন সর্ব্বে-সর্ব্বা! সে যেখানে ইচ্ছা যায়, যেখানে ইচ্ছা খায়, যেখানে ইচ্ছা থাকে! এখন সে এক প্রকার নিষ্কণ্টক। হীরার মার বয়স অনুমান ছচল্লিশ সাতচল্লিশ বৎসর।

ঘরের কাজকর্ম্ম সারিতে সারিতে আর বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে হীরার মার ক্ষুধার উদ্রেক হইল। তৃষ্ণায় বুক শুষ্ক হইয়া উঠিল। তখন সে তাড়াতাড়ি উনুনে আগুণ জ্বালিয়া রন্ধনার্থ হাঁড়ী পাড়িল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, হাঁড়ীতে জল ঢালিয়া তণ্ডুলের কলসীটী পাড়িল। বেলা হইয়াছে, ভাতে-ভাতেই কার্য্য শেষ করিতে হইবে। ঘরে আলু ও মসূরের ডাইল ছিল, হীরার মা একখানি নেকড়ায় তাহাই বান্ধিয়া ভাতের হাঁড়ীতে ফেলিয়া দিল। সে একটী মাটির কলসীর মধ্যে চাউল রাখিত। তাড়াতাড়ি কলসীটী পাড়িয়া দেখে যে, তাহাতে একটীমাত্র তণ্ডুল নাই। তখন সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। হীরার মার বয়স হইয়াছে, কেমন রকম হইয়া পড়িয়াছে, সব কথা ভুলিয়া যায়। ঘরে যে চাউল নাই, তাহা তাহার স্মরণ ছিল না। উপায় কি, স্থির করিতে না পারিয়া দ্রুতপদে আগড়ে তালাবদ্ধ করিয়া নীরদ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নীরদ বাবুর বাটীর নিকটেই হীরার মার বাস। যখন কোন কিছুর আবশ্যক হয়, তৎক্ষণাৎ বৌদিদির নিকট গমন করে। যখন হীরার মা নীরদের বাটীতে উপস্থিত

হইল, তখন তাহার বৌদিদি আহারাদি শেষ করিয়া পালঙ্কোপরি বিশ্রাম করিতেছিলেন। হীরার মাকে অসময়ে দেখিয়া সবিস্ময়ে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে আদ্যোপান্ত ঘটনা প্রকাশ করিল। তখন নীরদ বাবুর পত্নী তাহাকে তণ্ডুল ও অন্যান্য কতকগুলি উপকরণ প্রদান করিলেন। হীরার মা হাসিতে হাসিতে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

হীরার মা পরিতোষরূপে আহারাদি করিয়া থালা ঘটী প্রভৃতি উত্তমরূপে ধৌত করিল, রন্ধন গৃহটী পরিষ্কার করিয়া রাখিল এবং একটী তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বিশ্রামার্থ পা ছড়াইয়া দাওয়ায় বসিয়া পড়িল। প্রত্যহই আহারান্তে একটু বিশ্রাম করা তাহার অভ্যাস। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হীরার মার গৃহে একটী চর্‌কা আছে, সে এখন সেই চর্‌কাটী লইয়া সূতা কাটিতে আরম্ভ করিল। ইহাই তাহার বিশ্রাম। সে প্রতিদিন আহারান্তে এইরূপ চর্‌কা লইয়া বিশ্রাম করে, কোন কোন দিন রাত্রিকালেও সূতা কাটা ফাঁক যায় না। ইহাই তাহার উপজীবিকা। এই উপায়ে অতি কষ্টে যাহা কিছু উপার্জ্জন হয়, হীরার মা তদ্দ্বারাই মনের সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সে পরের দ্বারস্থ হইতে—পরের নিকট ভিক্ষা করিতে তাদৃশ ভালবাসে না। তবে নিতান্ত ভালবাসে বলিয়াই তাহার বৌদিদির কাছে যায়, প্রাণের কথা খুলিয়া বলে, আবশ্যক হইলে কিছু চাহিয়াও লয়।

পাঠক মহাশয়ের বোধ হয়, এখন হীরার মার চর্‌কা কাটা ভাল লাগিবে না, কারণ যদি আহারান্তে চেয়ারে বসিয়া অথবা পালঙ্কে কোন রকম নাটক নভেল পড়া হইত,

তাহা হইলে পাঠক মহাত্মাদিগের হৃদয়ের পরিতুষ্টি জন্মিত। কিন্তু হীরার মার দ্বারা সে আশা ফলবতী করিবার উপায় নাই। অতএব আর হীরার মার নিকট থাকিয়া পাঠক মহাশয়দিগকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না, এখন চলুন অন্যদিকে যাই।
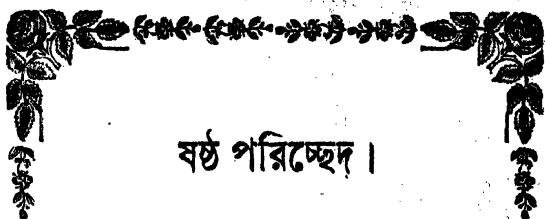
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বামুন দিদি।

রাজনগর গ্রামখানি নিতান্ত মন্দ নহে। গ্রামের উপর দিয়া ইংরাজ বাহাদুরের একটী সুবৃহৎ রাস্তা। গ্রামের মধ্যে পুলিসষ্টেশন, একটী ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং একটী ডাক্তারখানাও আছে। ব্যবসায়ীদিগের দোকানও বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ভদ্রলোকের বালিকা-দিগের শিক্ষা-বিধানার্থ একটী বালিকা বিদ্যালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। গ্রামখানিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি বহু সংখ্যক ভদ্রলোকের বাস। ফল কথা, এই গণ্ডগ্রামখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পাঠক মহাশয়েরা এতক্ষণ কেবল হীরার মার কুটীরের কথা আর নীরদ বাবুর গল্পই শুনিয়া আসিতেছেন; সুতরাং এক কথা বহুক্ষণ ভাল লাগে না বলিয়া বোধ হয়, বিরক্তও হইতে পারেন। অতএব চলুন্ এখন আপনাদিগকে বামুন দিদির নিকট লইয়া যাই। ইনি কি বৃদ্ধ, কি যুবা, বালক, কি নর, কি নারী, সকলেরই বামুন দিদি।

মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, একটী স্ত্রীলোক কিরূপে সকলের বামুন দিদি হইতে পারে? পিতা যাহাকে দিদি বলিবেন, পুত্রের উচিত তাহাকে পিসী বলা; কিন্তু তাহা না হইয়া পিতা-পুত্রে একজনকে যে দিদি বলিয়া সম্বোধন করে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। যাহা হউক, আমরা এ কথার আর মীমাংসা কি করিব, বামুন দিদি নিজেই ইহার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। বামুন দিদির সে বিষয়েও বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে। তিনি দুই চারিখানি পুস্তকও পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাকেন যে, জগন্মণ্ডলে চাঁদ একটীমাত্র; কিন্তু সকলেই "চাঁদ মামা চাঁদ মামা" বলিয়া সম্বোধন করে। পিতাও বলেন, চাঁদ মামা; পুত্রও বলে চাঁদ মামা। এইত গেল এক কথা; দ্বিতীয়তঃ শরৎকালে শ্রীশ্রীশারদীয়া মহামায়ার আগমনে সকলেই দেবীকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া থাকেন। পিতা দেবীকে যখন "মা" বলিয়া ডাকেন, তখন পুত্র "ঠাকুর মা" বলে না কেন?—তা না হয়ে পুত্রও সেই "মা" বলিয়া ডাকিয়া থাকে। সুতরাং একজন স্ত্রীলোক যে সকলের দিদি হইবে; ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। বামুন দিদি এইরূপ মীমাংসা করিয়া সকলের নিকটেই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

পাঠক মহাশয়েরা এক কথাতেই বামুন দিদির বুদ্ধিমত্তার একরূপ পরিচয় পাইলেন। এখন তাঁহার রূপের কথা না শুনিলে আপনাদিগের কৌতূহলের নিবৃত্তি হইবে না। বামুন দিদির বয়স ৩৫।৩৬ বৎসর, কিন্তু দেখিলেই অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী বলিয়া অনুভব হয়। তাঁহার প্রকৃত বয়স অনুমান করে কাহার সাধ্য? তাঁহার রূপের বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়, আমার লেখনীর তাদৃশ ক্ষমতা নাই, তথাপি

পাঠকগণকে জানাইবার জন্য যাহা কিছু পারি বলিতেছি। শুনিয়াছি, কবিরা গৃধিণীগঞ্জিত বলিয়া নাসিকার উপমা দিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদিগের বামুন দিদির নাসিকা সেরূপ নহে। তাঁহার নাসিকা রুদ্রদেবের হস্তস্থিত শিঙ্গার অগ্রভাগের ন্যায় বক্র। নয়নপদ্ম দর্শন করিলে মার্জ্জারও লজ্জিত হইয়া বনমধ্যে পলায়ন করে। আহা! কর্ণদ্বয় করিকর্ণবিনিন্দিত অদ্ভুত দৃশ্য! দাঁতগুলি যেন একটী বৃহদাকার কপর্দ্দক। মস্তকে কেশপাশ এত অধিক যে, সর্ব্বদাই পরচুলা পরিয়া থাকিতে হয়। বর্ণটী নিরূপণ করা কিছু কঠিন। পীতও নয়, লোহিতও নয়; শ্বেতও নয়, কৃষ্ণও নয়। পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন যে, তবে কি আমাদের বামুন দিদির বেরং।—না, তাহাও নহে। তাহার গায়ের রং সর্ব্ববর্ণের মিশ্রবর্ণ, অর্থাৎ শ্বেত-পীতাদি সমস্ত বর্ণ একত্র মিশ্রিত করিলে যে রং দাঁড়ায়, আমাদের বামুন দিদি সেই রঙের। এরূপ হইলে যেমন বর্ণ হইতে পারে, পাঠকগণ তাহা অনুভবে বুঝিয়া লইবেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর একটী রং আছে,—সে রংটী তাঁহার কথায়। তিনি সর্ব্বদাই রঙে আছেন।—রং ছাড়া একদণ্ডও থাকেন না।

বামুন দিদির রূপের বর্ণনা হইল, এখন পাঠক মহাশয়েরা তাঁহার বাড়ীখানির পরিচয় শ্রবণ করুন্। বামুন দিদির বাড়ীখানির চারিদিকেই ইষ্টকের প্রাচীর। বাড়ীর মধ্যে দুইখানি ঘর;—একখানি বড়, দ্বিতীয়খানি অপেক্ষাকৃত ছোট ও উচ্চতায় কম। ক্ষুদ্রখানিতে রন্ধন হয়, আর বড় ঘরখানিই রূপসীর বিলাসমন্দির। বিলাসগৃহের দাওয়া ইষ্টকে গাঁথা, তদুপরি সিমেণ্টের কাজ করা। সেই দাওয়ার দেয়ালে অনেকগুলি হুঁকা দড়ীতে ঝুলান আছে, প্রত্যেক হুঁকাতেই

এক একটী মুখ-নল সংলগ্ন। ঘরের ভিতর একখানি বৃহৎ তক্তাপোষ, তদুপরি দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা। তাহার পাশে একখানি ছোট তক্তা, তাহার উপরে একটী পাটীপাতা এবং তিন চারিটী তাকিয়া সাজানো। ঘরের একপার্শ্বে একটী কাষ্ঠের সিন্দুক, তাহার উপর একটী বাঁধা হুঁকা এবং একটী বাঁয়া ও একটী তবলা রহিয়াছে। সিন্দুকের পাশে একখানি জলচৌকী, তদুপরী পিত্তল-কাঁসার তৈজসপত্র সজ্জিত। বামুন দিদির ঘর দুইখানি কিন্তু খড়ের ছাউনি। সংগীত শাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ আদর আছে, কিন্তু আলোচনা বড় কম। গ্রামের মধ্যস্থলে হইলে তিনি এ ভাবে গৃহ সাজাইয়া মনের সাধে আসর জমকাইতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার বাটীখানি গ্রামের প্রান্তসীমায় অবস্থিত। পরন্তু প্রান্তভাগে বলিয়া বামুন দিদিকে একাকিনী থাকিতে হয়না, নব্যসম্প্রদায়ের ছোকরা বাবুদিগের কল্যাণে তাঁহার গৃহ সর্ব্বদাই জনাকীর্ণ। বামুন দিদির রসিকতায় সকলেরই প্রাণ-মন বিমোহিত।

আমরা বিদ্যাসুন্দরের হীরামালিনীর কথা শুনিয়াছি। যেরূপ শুনা আছে, তাহাতে বোধ হয়, সেই হীরাই যেন বামুন দিদিরূপে আকার পরিবর্ত্তন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। কথায় কথায় তিনি ছড়া কাটেন, কথায় কথায় তাঁহার সংগীত, কথায় কথায় তাঁহার মুখের রহস্যের ফোয়ারা বহির্গত হয়। তিনি যখন বেশবিন্যাস করেন, মনে করেন, রূপের ছটায় স্বর্গবিদ্যাধরীরাও লজ্জা পায়। তিনি দর্পণে আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখিয়া গর্ব্বভরে আপনিই পুলকিত হইয়া উঠেন।

বামুন দিদিও হীরার মায়ের মত স্বাধীনা।—পৃথিবীতে আপনার বলিতে কেহই নাই। তবে এই প্রভেদ যে, হীরার মা বিধবা, আমাদের বামুন দিদি চিরসধবা। কিন্তু কোথায়

তাঁহার জন্ম, কোথায় বিবাহ হয়, তাহা কেহই জানে না। বামুন দিদির নিজ মুখেই শুনা আছে যে, তাঁহার যখন দুই বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহার পিতামাতার কাল হয়। তিনিই পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর মাতুলালয়ে প্রতিপালিতা হন, সেই স্থানেই তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর মাতুল সপরিবারে তীর্থযাত্রায় গিয়া নৌকাসহ জলমগ্ন হইয়া যান। বামুন দিদি ও তাঁহার পতি সেই সমভিব্যাহারে ছিলেন। উহাঁরা উভয়ে একখানি কাষ্ঠ-ফলক অবলম্বন করিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলে একটী দয়াবান্ মহাত্মার সাহায্যে কাশীধামে উপস্থিত হন। দিন কতক তথায় অবস্থানের পর তাঁহার পতি নিরুদ্দেশ হইলেন। বামুন দিদি তখন নিরুপায়। পিতৃকুল উভয় কুলই গিয়াছে, পতিকুলেও আর কেহ নাই। অগত্যা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া নানাস্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শেষে এই রাজনগরে আসিয়া মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। পতি নিরুদ্দেশ, সুতরাং সধবার চিহ্ন আর জন্মেও বামুন দিদি পরিত্যাগ করেন নাই।

বামুন দিদির আর একটী মহৎ গুণ এই যে, তিনি কাহারও প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হন না, তাঁহার শরীরে যেন ক্রোধ নাই। তিনি সকলকেই সমান আদর-যত্ন করেন, কেহ না ডাকিলেও আপনি ডাকিয়া কথা কহেন এবং কেহ না ডাকিলেও আপন ইচ্ছায় সকলের বাড়ী যাতায়াত করিয়া থাকেন।

পাঠক মহাশয়গণ এখন বামুন দিদিকে পাইলেন, বিলাস মন্দির দেখাইয়া দিলাম, মনের সুখে আমোদ-আহ্লাদ করুন্। বামুন দিদি কোন বিষয়েই অক্ষম নহেন। আমি এখন একবার অন্যদিকে যাই।
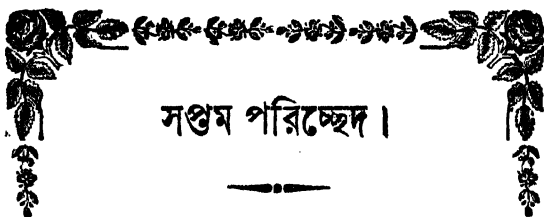
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তিনিই এই বসন্ত-লতা।

একটী গ্রামের উল্লেখ করিতে হইলেই জেলা বা পরগণার নাম করিতে হয়, সমস্ত আখ্যায়িকাতেই এইরূপ রীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু আমাদের এই উপাখ্যানে পাঠকগণ প্রায় সে নিয়ম দেখিতে পাইবেন না। আমরা অনেকস্থলে গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছি বটে, কিন্তু জেলা বা পরগণার কথা আদৌ প্রকাশ করি নাই।—তত আবশ্যক বিবেচনা হয় নাই। তবে যে স্থানে আবশ্যক বোধ হইয়াছে, তথায় জেলারও দর্শন পাইবেন।

রামগড় গ্রামটী বিলক্ষণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও বৃহৎ। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ কায়স্থের একত্র বাস। তদ্ভিন্ন অন্যান্য জাতিও অনেক আছে। গ্রামটীর শোভার এরূপ পারিপাট্য যে, যে স্থানে ব্রাহ্মণের বাস, তথায় অন্য জাতির অধিষ্ঠান নাই। যেখানে কায়স্থেরা বাস করে, তথায় কায়স্থ ব্যতীত অন্য জাতি দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ এক এক জাতি এক একটী পাড়া লইয়া বসতি করিতেছে। প্রত্যেক পাড়ারই নাম ভিন্ন ভিন্ন; ব্রাহ্মণপাড়া, কায়স্থপাড়া, তাঁতিপাড়া ইত্যাদি আখ্যায় প্রতি

পাড়া অভিহিত হয়। ব্রাহ্মণপাড়ায় ন্যূনাধিক ৭০।৭৫ ঘর ব্রাহ্মণের বাস।

ব্রাহ্মণপাড়ার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি। গ্রামের মধ্যে তিনিই দলপতি, সকলেই তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা ও মান্য করে। তাঁহার অমতে বা তাঁহার বিপক্ষে কেহই কোন কাজ করিতে সাহসী হয় না। ফল কথা, রাধাকৃষ্ণ বাবু অমায়িক, দয়ালু, পরোপকারী ও দেশ-হিতৈষী।

অল্প বয়সেই রাধাকৃষ্ণ বাবুর বিবাহ হয়। বিবাহের পর যথাসময়ে তিনি দুইটী কন্যারত্ন লাভ করেন।—জ্যেষ্ঠার নাম বসন্ত-লতা, দ্বিতীয়ার শশীমুখী। সময় কাহারও হাত-ধরা নহে, কেহই তাহাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। দেখিতে দেখিতে শশীকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দুইটী কন্যাই যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল। শশীমুখী বসন্ত-লতা অপেক্ষা এক বৎসরের কনিষ্ঠ। বসন্ত এখন দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। কুলীন ব্রাহ্মণের কন্যাদায়, বড় সহজ ব্যাপার নহে, রাধাকৃষ্ণ বাবু একান্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি সুপাত্রের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন পূর্ব্ব হইতেই বিধিকর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়া থাকে; নতুবা স্ত্রীজাতি কে কোথায় অবি-বাহিতা দেখিতে পাওয়া যায়? তবে যাহারা বিবাহের পূর্ব্বেই অকালে মানবলীলা সম্বরণ করে, তাহাদিগের কথা পৃথক্। যাহার অন্তর পবিত্র, যাহার হৃদয়ে কুটিলতা স্থান পায় না, জগদীশ্বর সর্ব্বদাই তাহার বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। রাধাকৃষ্ণ বাবু অচিরেই দুইটী সুপাত্র প্রাপ্ত হইলেন। শুভ

কার্য্যে বিলম্ব করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া শুভদিনে কন্যা দুইটীকে সুপাত্রকরে সম্প্রদান করিলেন। মহাসমারোহে এক দিবসেই কন্যাদ্বয়ের বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

রাধাকৃষ্ণ বাবুর আর পুত্র হইবার আশা নাই। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান পঁয়তাল্লিশ ছচল্লিশ। শশীমুখী কনিষ্ঠা কন্যা, তাহার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইতে চলিল, তখন আর যে গৃহিণীর পুনরায় গর্ভ হয়, ইহা কদাচ সম্ভব পর নহে। এখন রাধাকৃষ্ণ বাবুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ইচ্ছা যে, কন্যা দুইটীর গর্ভে সন্তান-সন্ততি জন্মিলেই তাঁহারা পরমসুখী হইতে পারেন।

কন্যা দুইটীকে পরহস্তে সমর্পণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ বাবু প্রথম প্রথম কিছুদিন অত্যন্ত মর্ম্ম যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন। যাহাদিগকে শৈশবাবধি বহুকষ্টে লালন পালন করিলেন, আজ তাহাদের মায়ামমতা ভুলিয়া পরগৃহে বিসর্জ্জন করিতে হইল। মায়াময় সংসারে মহামায়ার এই মায়া বিস্মৃত হওয়া বড়ই সুকঠিন। কি করিবেন, সংসারের গতি—সংসারের প্রথা চিরদিনই এইভাবে চলিয়া আসিতেছে বিবেচনা করিয়া যথাকথঞ্চিৎ মনকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

ক্রমে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে লাগিল। কন্যাদ্বয়ের সন্তান-সন্ততি না হওয়াতে রাধাকৃষ্ণ বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী দিবানিশি চিন্তাকুলভাবে অবস্থিতি করেন। যদিও কন্যাদ্বয় শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছে, তথাপি সর্ব্বদাই তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাধাকৃষ্ণ বাবু পরম ধর্ম্মশীল। তিনি শাস্ত্রালোচনা দ্বারাই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত

বসন্ত-লতা।

করিতেন। তিনি যার পর নাই পিতৃমাতৃভক্ত ছিলেন। অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি পিতৃমাতৃহীন হইয়া পড়েন। জ্ঞানোদয় হইবার পর আজীবন তিনি উদ্দেশে পিতৃমাতৃ-পদে প্রণাম করিয়া জলগ্রহণ করিতেন। পিতামাতার শোক আজীবনই তাঁহার হৃদয়মধ্যে জাগরূক ছিল। কন্যা দুইটীর মুখ দেখিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সে শোক ভুলিয়া ছিলেন, কিন্তু এখন আর সে কন্যারাও নিকটে নাই। পুত্র নাই, দৌহিত্র জন্মিলে ইহপর উভয় লোকেই সুখী হইবেন আশা ছিল, অদ্যাপি আশা পূর্ণ হইল না। এই সমস্ত কারণে রাধাকৃষ্ণ বাবুর চিত্ত একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। তীর্থ-পর্য্যটনে মনের শান্তিলাভ হইতে পারে বিবেচনায় সহধর্ম্মিণীর মতানুসারে তাহাতেই স্থির সংকল্প হইলেন।

বসন্তলতা এখন ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী, শশীমুখী তদপেক্ষা এক বৎসরের কনিষ্ঠা। রাধাকৃষ্ণ বাবু দুইটী কন্যাকেই বাড়ীতে আনয়ন করিলেন। একদিন দুইদিন করিয়া সপ্তাহ, অতীত হইলে রাধাকৃষ্ণ বাবু কন্যাদ্বয়ের নিকট তীর্থ-যাত্রার সংকল্প প্রকাশ করিলেন। বসন্ত ও শশীমুখী পিতা মাতার এই সংকল্প অবগত হইয়া একান্ত কাতর হইয়া পড়িল, নানাবিধরূপ আপত্তি করিয়া জনক-জননীকে কৃতসংকল্প হইতে নিরস্ত হইতে প্রার্থনা করিল; কিন্তু রাধাকৃষ্ণ বাবু প্রতিজ্ঞা হইতেই কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি মিষ্টবাক্যে কন্যাদ্বয়কে সান্ত্বনা করিয়া নানাবিধরূপে প্রবোধ প্রদান করিলেন।—বলিলেন, "আমরা যখন যে কোনস্থানে থাকিব, তোমাদিগকে সংবাদ দিব। তোমরাও আমার অনুসন্ধান লইতে ত্রুটি করিও না। তোমাদের গর্ভে সন্তান-সন্ততি জন্মিলে আসিয়া দেখিব,—পরমসুখী হইব। আমরা

বৃদ্ধ হইয়াছি, বৃদ্ধবয়সে তীর্থ দর্শন,—তীর্থ সেবা—ধর্ম্মাচরণই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এ বিষয়ে বাধা দেওয়া বা ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে নিরস্ত করা উপযুক্ত পুত্র-পুত্রীর কার্য্য নহে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা উভয়ে পতীপুত্রবতী হইয়া পরমসুখে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত কর।”

পিতার মুখে এইরূপ সকরুণ বাণী শ্রবণ করিয়া কন্যাদ্বয়ের নেত্রকমল অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহারা আর কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। তখন রাধাকৃষ্ণ বাবু আপনার বিষয়-সম্পত্তি সমান দুই অংশে উইল করিয়া দুই কন্যাকে প্রদান করিলেন। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল। শুভক্ষণে জগদীশ্বর স্মরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণ বাবু সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমরা যে বৌদিদির উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার নাম এখনও পর্য্যন্ত আপনারা জানিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আপনাদের অবশ্য হৃদয়ের উদ্বেগ হইতে পারে। আর অধিকক্ষণ আপনাদিগকে উৎকণ্ঠিত রাখা উচিত নহে। বৌদিদি অপর কেহই নহে, রাধাকৃষ্ণ বাবুরই জ্যেষ্ঠা কন্যা;—তিনি এই বসন্ত-লতা!

বসন্ত-লতা এখন পিতৃ সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের অধিকারিণী। অপর অর্দ্ধাংশ তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী শশীমুখীর করগত হইয়াছে। শশীমুখী পিতার তীর্থযাত্রার পর কতিপয় দিন পিতৃগৃহে থাকিয়া শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করিয়াছেন। বসন্তও পতিগৃহ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। রাজনগর রামগড় হইতে অধিক দূর নহে, সুতরাং নীরদ বাবু সর্ব্বদাই আসিয়া শ্বশুর-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।
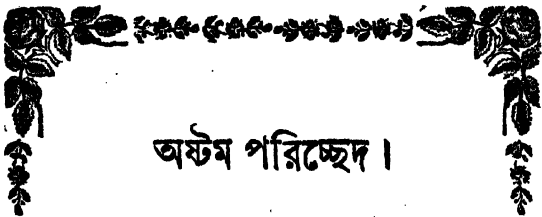
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

খোস গল্প।

পল্লীগ্রামে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকেরা আহারান্তে একস্থানে একত্র হইয়া নানারূপ গল্প জুড়িয়া দেয়। তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে রন্ধনের কথাই তাহাদিগের প্রথম ও প্রধান সম্ভাষণ। কাহার কি রন্ধন হইয়াছিল, কে রান্ধিয়াছিল, কিরূপ আহার হইয়াছে, প্রথমতঃ এই সকল আলোচনাই হইতে থাকে। ক্রমে পরের ঘরের কুৎসা বাহির হয়। অমুকের মেয়ের চরিত্র বড় ভাল নয়, অমুকের বৌ বড় নির্লজ্জ—স্বামীকে দেখে ঘোম্‌টা দেয় না, অমুকের বৌ শাশুড়ীর সঙ্গে মুখে মুখে উত্তর দেয়, এইরূপ নানা আন্দোলন হইতে থাকে। রূপের কথা উঠিল ত আর রক্ষা নাই। নারীজাতির অন্তর এত কুটিল যে, তাহারা প্রাণান্তে প্রকৃত সুন্দরীকেও সুন্দরী বলিবে না,—একটা না একটা দোষ বাহির করিবেই করিবে। সুলোচনার কপালটা উঁচু, শ্বেতা-ঙ্গিনীর নীচের ঠোঁটটা যেন উল্টে আছে, কাদুর চলনটা বড় খারাপ, কিরণবালা যেন লম্বা তালগাছ, ক্ষীরর কোমরটা

বড় মোটা, এই রকম একটা না একটা দোষ দেখাইয়া তাহাকে কুরূপা প্রমাণ করাই নারীজাতির স্বভাব। যদি কেহ বলিল, "ভাই! গোলাপী কিন্তু বেশ সুন্দর।" অমনি একজন বলিয়া উঠিল, "সুন্দর বটে, কিন্তু অত বেঁটে হওয়া আর হাত-পা অত ছোট হওয়া ভাল দেখায় না।" যেখানে দশজন স্ত্রীলোক একত্র হয়, সেইখানেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজনগরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতেও আজি এইরূপ কতকগুলি স্ত্রীলোক একত্র হইয়া রহিয়াছে। সকলেই প্রায় সমবয়স্কা, তবে এক বৎসর বা দুই বৎসরের ছোট বড়। কেহ রূপবতী, কেহ গুণবতী, কেহ মলিনা, কেহ বা মধ্যমরূপা। সকলে একত্র হইয়া নানারূপ গল্প করিতেছে, হাস্য করিতেছে, কেহ বা গড়াইয়া গড়াইয়া অপরের গায়ে পড়িতেছে। ফল কথা, যেন আমোদের চূড়ান্ত!

দেখিতে দেখিতে হীরার মা আসিয়া উপস্থিত। হীরার মার কথাবার্ত্তা শুনিলে—হীরার মার এক রকম সে-কেলে ভাবভঙ্গী দেখিলে সকলেরই হাসি পায়। সে আসিয়া হঠাৎ এমন একটী কথা বলিল যে, কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। হাসির ধমকে আসর যেন জমিয়া উঠিল। বস্তুতঃ পাঠকবৃন্দ যদি তৎকালে সেই রঙ্গস্থলে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আপনারাও হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

একস্থানে এত যুবতী, এত হাসি, এত আমোদ, তথাপি একটী রমণী বিষন্ন বদনে অধোমুখে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখে কথা নাই, হাস্য নাই, কিছুই নাই। এতক্ষণ কেহই তাহার প্রতি ততদূর লক্ষ্য করে নাই, হঠাৎ সেই দিকে

হীরার মার দৃষ্টি পড়িল। হীরার মা মুখভারী করিয়া থাকা দেখিতে পারে না, মলিন মুখ সে ভাল বাসে না। সে সর্ব্বদাই হাসিখুসী ও আমোদ-আহ্লাদ ভালবাসে। রমণীর সেই ভাব হীরার মার প্রাণে সহ্য হইল না। সে তাড়াতাড়ি তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন্ লা ফুল-মণি! তোকে আজ এমন দেখ্ছি কেন? তোর হয়েছে কি? তোর সোয়ামী কি কিছু বলেছে লা?"

যুবতীর নাম ফুলমণি। ফুলমণি নিরুত্তর!—সে কোন উত্তরই দিল না। তখন হীরার মা ধীরে ধীরে তাহার চিবুকখানি ধরিয়া আদর করাতে ফুলমণির চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রুবারি পতিত হইতে লাগিল। তাহার রোদন দেখিয়া আসর যেন একেবারে নিস্তব্ধ! এত হাসি—এত ধূম যেন একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। সকলেই বিষণ্ণ বদনে ফুলমণির দিকে চাহিয়া রহিল।

হীরার মা মিষ্টবাক্যে তাহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ফুলমণি কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। তখন সকলে বুঝিল যে, সামান্য কারণে স্বামী যে আপনার পরিবারের নিন্দাবাদ করে, ইহা নিতান্ত অন্যায়। বিশেষ পরিবারের নিন্দাবাদে যে আপনার কলঙ্ক রটে, তাহা বুঝিতে পারে না। প্রকৃত নিন্দার কাজ করিলেও স্বামী কলঙ্কভয়ে তাহা গোপন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, হীরার মা ও অন্যান্য যুবতীরা নানাবিধ মিষ্টবাক্যে ফুলমণিকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। ফুলমণি তখন নয়নাশ্রু মার্জ্জন করিয়া সকলের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। ইত্যবসরে অদূরে একটী সংগীতস্বর সকলের কর্ণগোচর হইল।

(গীত।)

প্রাণের অধিক ভালবাসি যারে।
সে বা কেন মিছা দোষ দেয় মোরে॥
যারে ভালবাসি, সে দেয় গলে ফাঁসি,
দারুণ মরমজ্বালা হলো তার তরে।
তাঁর চরণে ধরি, কত মিনতি করি,
তবুও সে বিনা দোষে দোষে আমারে॥

গান শুনিয়া সকলেই চমকিত প্রাণে উন্মুখ হইয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে বামুন দিদি সেই রঙ্গস্থলে উপস্থিত। বামুন দিদিই সেই রসের গান গাইতে গাইতে আসিতে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আবার আসরে একটী উচ্চ হাস্য সমুত্থিত হইল। বামুন দিদিও হাসিতে লাগিলেন, তাঁহার হাসি আর নিবৃত্তি পায় না। তিনি হাসিতে হাসিতে নাচিতে আরম্ভ করিলেন।

এক রকম তামাসা বা রহস্য কখনই অধিকক্ষণ ভাল লাগে না। বামুন দিদি ক্ষণকাল নৃত্যের পর উপবেশন করিলেন। ক্রমে গল্প আরম্ভ হইল। বামুন দিদি বলিলেন,, "ভাই! আজি কেমন মনটা বড় খারাপ হয়েছে, তাই এদের ওদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি। আগে ঐ মেজো চাটুর্য্যেদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তাদের ছোট বউটা দেখ্‌তে যেমন কদাকার, কথাবার্ত্তা গুলোও তেমনি—আর ভারী বেহায়া। সেখানে মন বুঝ্‌লো না বলে ভট্টাচার্য্যদের বাড়ীতে গেলেম। তাদের এলোকেশী কেবল সোয়ামী নিয়ে আছে। দিন রাত্রির সোয়ামীর সঙ্গে হাসি তামাসা। ! করি, সেখান থেকে বরাবর কৈবর্ত্তদের বাড়ীতে গেলেম।

কৈবর্ত্তদের গিন্নি ত অহঙ্কারে কথাই কয় না। মনে ধিক্কার ধল্লো; আর কোথাও না গিয়ে বরাবর তোমাদের কাছেই এলেম। এখন প্রাণটা জুড়ালো। দুদণ্ড দুটো খোস গল্প কোরেও ঠাণ্ডা হব।”

বামুন দিদি এইরূপে সকল বাড়ীর স্ত্রীলোকেরই কুৎসা গাইতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের রূপ ত পাঠকবর্গকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহাতেই তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না। যদি তিনি প্রকৃত রূপসী হইতেন, তাহা হইলে যে কি করিতেন বলিতে পারি না।

এই আসরে আমাদিগের বসন্তলতাও ছিলেন। বামুন দিদি এতক্ষণ তাঁহার দিকে লক্ষ্য করেন নাই। হঠাৎ দৃষ্টিপাত করাতে বসন্ত যেন একটু লজ্জিতা হইলেন। বামুন দিদিও বসন্তকে বৌদিদি বলিয়া ডাকিত, আবার কখন কখন বসন্ত বলিয়াও সম্বোধন করিত। বামুন দিদি ধীরে ধীরে বসন্তের নিকটে গিয়া বলিল, “কি বৌদিদি! আজ আবার এত লজ্জা কেন? নীরদ বাবু কেমন আছেন, বল দেখি?”

বসন্ত কোন উত্তর না দিয়া মৌনভাবেই রহিলেন। কেবল তাঁহার তাম্বুলরাগরঞ্জিত অধরপ্রান্তে ঈষৎ মৃদুহাসি দেখা দিল। আহা! সে মধুর হাসির শোভা নীরদের নয়ন মনের প্রীতিকর সন্দেহ নাই; এ হাসি নীরদের চক্ষে পড়িলেই সার্থক হইত। বামুন দিদি পুনঃ পুনঃ নীরদ বাবুর কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বামুন দিদির প্রকৃতিসিদ্ধ স্বভাবই এই যে, কোন যুবতীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহার স্বামী কিরূপ ভালবাসে, কিরূপ আমোদ আহ্লাদ করে, একথা অগ্রেই জিজ্ঞাসা করেন। সেই জন্যই আজি

বৌদিদিকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বসন্ত সে কথায় কোন উত্তরই প্রদান করিলেন না।

তখন বামুন দিদি সে কথা ছাড়িয়া অন্য কথা তুলিলেন। বসন্তের সহিত নানা বিষয়ের গল্প হইতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বসন্তের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে তীব্র-দৃষ্টি করিয়া বামুন দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসন্ত! আজ ভাই তোমাকে কেমন কেমন দেখাচ্চে। সত্তি কোরে বল্ দেখি, কি হয়েছে?"

বসন্ত কোন কথা না কহিয়া অধোবদনে রহিলেন; কেবল বলিলেন, "কৈ, কি হবে ভাই?"

এইরূপ কথোপকথন হীরার মার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ বসন্তের নিকট উপস্থিত হইল। বামুন দিদি হীরার মাকে ইঙ্গিত করিয়া বসন্তের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখাইলে হীরার মা তীব্রদৃষ্টিতে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে দেখিতে লাগিল। ক্ষণকাল এইরূপে নেত্রপাত করিয়া তাহার অন্তর আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। সে একে পায় আরে চায়;—একেবারে উন্মত্ত প্রায় হইয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিল।

(গীত।)

এবার আমার বৌদিদির কপাল ধরেছে।
কপাল ধরেছে আমারি কপাল ধরেছে॥
বড় আশা ছিল মনে, কোলে পাবে পুত্রধনে,
বিধাতা সদয় হয়ে মিলিয়ে দিয়েছে।
নীরদ বাবুর কাছে যাব, নেচে নেচে খবর দিব,
অনেক দিনের আশা এবার পূর্ণ হয়েছে॥

হীরার মার গান শুনিয়া বসন্ত লজ্জায় অধোমুখী

হইলেন। তাঁহার গর্ভলক্ষণে প্রকৃত পক্ষে সকলেরই আনন্দ সঞ্চার হইল। বামুন দিদি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া অগ্রেই সংবাদ দিবার জন্ত নীরদ বাবুর বাটীতে গমন করিলেন। এদিকে হীরার মা বৌদিদিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধীরে ধীরে পশ্চাদ্‌গামী হইল। দিবাও অবসান প্রায়। সে দিনের মত আসর ভাঙ্গিল। যুবতীগণ হাসিতে হাসিতে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিল।
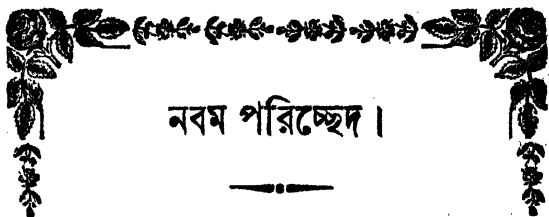
নবম পরিচ্ছেদ।

ভরা আমোদ।

পিতা-মাতার পরলোকের পর হইতে নীরদ বাবু এক-দিনের জন্যও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন নাই। পৈতৃকসম্পত্তি যাহা আছে, তাহা দ্বারা অনায়াসে এক প্রকার সুখস্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। তাহার উপর আবার শ্বশুরের বিষয়েরও অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং অর্থোপার্জ্জনার্থ বিদেশ গমনের কিছুমাত্র আবশ্যক করে না। তবে পিতামাতার অভাবে দিবানিশিই তাঁহার অন্তর আকুল। এতদিনেও তিনি মন স্থির করিতে পারেন নাই। পাছে মনের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়, এই জন্য দিবানিশি, নাটক, নভেল, উপন্যাস, পুরাবৃত্ত, সাহিত্য প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করেন। যখন তাহাতেও মনের উদ্বেগ নিবৃত্ত না হয়, তখন সহধর্ম্মিণীর সহিত নানাবিধ মধুরালাপে চিত্ত বিনোদনে যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

আজি নীরদ বাবু একাকী নিদ্রিত। তাঁহার সহধর্ম্মিণী বসন্ত-লতা প্রতিবাসিনীদিগের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছেন, পাঠক মহাশয়দিগের তাহা অবিদিত নাই। সহসা নীরদ

বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। অমনি বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন।—দেখিলেন, বেলা অবসান প্রায়, একঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টামাত্র অবশিষ্ট আছে। তিনি পুনরায় অন্তঃপুরে আগমন পূর্ব্বক নিজ কক্ষে বসিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। সেখানি জয়দেব। বিরহবিধুরা রাধিকার করুণবেদন পাঠ করিয়া তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সেখানি রাখিয়া আর একখানি পুস্তক গ্রহণ করিলেন।—দেখিলেন, সেখানি সীতার বনবাস। সেইখানি পড়িতে পড়িতে নীরদ বাবু রামচন্দ্রকে নানারূপে নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রঘুপতি কি প্রকারে নিরপরাধিনী কোমলাঙ্গী পতিপ্রাণা রমণীকে বনবাসে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন?—তিনি যার পর নাই নির্দ্দয়, তাঁহার অন্তর অভেদ্য পাষাণে গঠিত; নতুবা সামান্য রজকের কথায় পতিপ্রাণা পত্নীকে কিরূপে একাকিনী বনবাসে প্রেরণ করিলেন?

নীরদ বাবু এইরূপে কিয়ংক্ষণ রামচন্দ্রের প্রতি দোষারোপ করিয়া পুস্তকখানি রাখিলেন; আর ভাল লাগিল না। তিনি পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া বহির্ব্বাটীতে আগমনপূর্ব্বক চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মানসিক উদ্বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। পাঠকগণ বোধ হয়, নীরদ বাবুর এরূপ চাঞ্চল্যের ও উদ্বেগের কারণ বুঝিতে পারিয়াছেন?—না বুঝিবেন কেন; আজি কালি আপনাদিগের মধ্যেও অনেক নীরদ বাবু দেখিতে পাওয়া যায়। নীরদ বাবু এক নিমেষের জন্য পত্নীহারা হইলে যেন প্রলয়জ্ঞান করেন। বসন্ত-লতার বিলম্ব হইতেছে কেন, কখন্ তাহার সেই অমল-কমল বিনিন্দিত মুখশশী দেখিয়া তাঁহার চিত্তচকোর পরিতৃপ্ত হইবে, এই চিন্তাতেই তাঁহার চিত্ত একান্ত

আকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই মুহুর্মুহুঃ বহির্ব্বাটীতে গিয়া পথপানে নেত্রপাত করিতেছেন।

আজি কালি ইচ্ছাপূর্ব্বক লোকে স্ব স্ব গৃহিনীকে স্বেচ্ছা-চারিতাপদ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এইরূপ সংস্কার যে, এরূপ না করিলে ভালবাসা প্রকাশ পায় না। কুহকিনী রমণী জাতির এরূপ মোহিনীশক্তি যে, একটু অনুনাসিক উচ্চারণে স্বামীর নিকট মনোদুঃখ জানাইলে বা অভিমান প্রকাশ করিলে অমনি তিনি গলিয়া যান। কাজে কাজেই রমণীরা প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়—কাজে কাজেই তাহারা তাম্বুলরাগে অধর লোহিত করিয়া প্রতিবাসিনীদিগের বাড়ীতে বেড়াইতে যায়, গল্পের ছটায়—হাসির ছটায় প্রাণ মজায়। এদিকে তাঁহার স্বামী বোকাগঙ্গারামের মত বসিয়া প্রিয়-তমার পশ্চাদ্ভাগ নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। আমরা সহরে এরূপ দেখিতে পাই না বটে, পল্লীগ্রামেই এই ব্যবহার অতি প্রবল। সহরে একজনের বাড়ী হইতে অপর বাড়ীতে সহজে যাইতে না পারাতেই ওরূপ প্রণালী স্থগিত আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলির মধ্যে সহরেও প্রায় দলে দলে এইরূপ কুলনারীগণকে বেড়াইতে দেখা গিয়া থাকে।

দুর্ম্মুখ রজক স্ত্রৈণ ছিল না, সেই জন্যই সে রামচন্দ্রের নিকট স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে উদাহরণ প্রদর্শন করে। প্রভু রঘুপতিও তাহার বচনানুসারে জানকীকে গহন কাননে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। যাহারা আপন দোষ জানিতে পারে এবং সেইটী প্রকৃত দোষ বলিয়া যাহাদের বিশ্বাস হয়, তাহারা সেই দোষ সংশোধনার্থ উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা নিজের দোষ অনুভব করিতে অসমর্থ, তাহারা কিরূপে পরের দোষ সংশোধন করিবে? নীরদ বাবু

আপনার দোষ দেখিলেন না, কিন্তু সচ্চরিত্র গুণধাম রামচন্দ্রের প্রতি দোষারোপ করিলেন। হায়! স্ত্রৈণতাই নানা অনর্থের মূল।

নীরদ বাবু প্রিয়তমার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া একান্ত উদ্বিগ্ন আছেন, হঠাৎ সদর দরজা খুলিয়া গেল। তিনি বসন্তের শুভাগমন বিবেচনা করিয়া চকিতনেত্রে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফল হইল। সম্মুখে বামুন দিদি আসিয়া উপস্থিত। নীরদ বাবু আপনার মনশ্চাঞ্চল্যের ভাব গোপন করিলেন বটে, কিন্তু রসিকা সুচতুরা বামুন দিদি তাহা বুঝিতে পারিলেন। নীরদ বাবু যে প্রণয়িনীর জন্য উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বামুন দিদির আর তাহা বুঝিতে বাকী থাকিল না। তিনি অমনি রসিকতার সুরে একটী গান ধরিলেন।

(গীত।)

কেন ভাব প্রাণনাথ অধীনীর তরে।
তোমা ছাড়া এ দাসী ত নহে কোন কালে॥
যদি ত্যজ তুমি, তবু অনাথিনী,
রবে তব ও চরণতলে।
তব ভালবাসা, সদা করি আশা,
ঐ ভালবাসায় বাঁধা চিরদিন;—
কি বলিব আর, ওহে গুণাধার,
দেখ মম হৃদিকবাট খুলে॥

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বামুন দিদি সর্ব্বদা রঙ্গেই আছেন। আনন্দের ভরে গান সমাপ্ত করিবামাত্র নীরদ বাবু কাল্পনিক আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

বামুন দিদির আর আনন্দ ধরে না। কথা না বলিতে বলিতেই তিনি হাসিয়া একেবারে অস্থির। তাঁহার হাসি আর থামে না। বহুকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "নীরদ বাবু! আজি ভাই বড় আমোদের দিন।"

নীরদ বাবু এ সমস্ত কথার ভাব কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় হইলেন। অবশেষে বলিলেন, "কি বামুন দিদি! আমি ত তোমার কথার মর্ম্ম কিছু বুঝ্তে পাল্লেম না।"

বামুন দিদি বলিলেন, "আচ্ছা নীরদ বাবু! আমি একটা সু-খবর দিব, কি খাওয়াবে আগে বল ?"

"আগে কি খবরটাই বল না ?"

"যদি খোস খবর হয়, তা হলে আমাকে কিছু খাওয়ান উচিত কি না বল দেখি ?"

"আচ্ছা, খাওয়ান যাবে, কি বল।"

"আগে কি খাওয়াবে বল, নৈলে আমি বল্‌বো না।"

"তুমি বল্‌বে না, তবে আমি খাওয়াব না।"

"তবে আর বল্‌বো না, আমি চল্লেম।"—এই বলিয়া বামুন দিদি গমনোদ্যত হইলে নীরদ বাবু ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, "আরে না না, যাবে কেন ? বসো! খুব পেট ভোরে লুচি—মণ্ডা খাওয়ান যাবে। কি ব্যাপার বল দেখি ?"

অমনি বামুন দিদি আনন্দভরে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ! এই দেখ দেখি, এইবার পথে এসো।"

"আর ভাই ভূমিকায় কাজ নাই, কি হয়েছে বল।"

নীরদ বাবুর এই কথা শুনিয়া বামুন দিদি মধুরবচনে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ নীরদ বাবু! আমাদের বৌদিদিকে কেমন কেমন দেখায় ভাই!"

"সে কি ?"—চমকিত হইয়া বিপরীত ভাব বুঝিয়া নীরদ বাবু বলিয়া উঠিলেন, "সে কি ? তবে কি বসন্ত-লতার চরিত্রে কোনরূপ দোষ ঘটেছে ?—না, তাও ত সম্ভব নয়।"

সহাস্যবদনে বামুন দিদি বলিয়া উঠিলেন, "আরে মিন্‌সে ! তা নয়, তা নয়।"

"তবে কি স্পষ্ট করে বল না ছাই ?"

বামুন দিদি নীরদ বাবুকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিলেন, "বলি, আমাদের বৌদিদিকে যেন পোয়াতী বোলে বোধ হয়।"

নীরদ বাবুর অন্তর আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। বলিলেন, "বল কি বামুন দিদি ! সত্য না কি ? এ যে ভরা আমোদ !"

বামুন দিদি বলিলেন, "নীরদ বাবু ! সাধে কি বল্‌ছিলেম যে, কিছু খাওয়াতে হবে। এখন ছাড়ছি নে। টাকা দেও, লুচি মণ্ডার যোগাড় করা যাক্।"

এইরূপ হাস্য-পরিহাস হইতেছে, ইত্যবসরে অদূরে বসন্ত ও হীরার মা দর্শন দিল। অনতিদূর হইতে দেখিয়া বামুন দিদি বলিলেন, "নীরদ বাবু ! আর চিন্তা করো না, ঐ তোমার প্রেমের পুতলি আস্‌ছে।"

বসন্ত অন্দরে প্রবেশ করিলেন। হীরার মার আনন্দ হৃদয়ে আর ধরে না। আজি নীরদের অন্তর সমস্ত শোক দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সুখহ্রদে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যাদেবী সমাগত হইলেন দেখিয়া, সে দিনের মত বামুন দিদি ও হীরার মা বিদায় লইয়া আপনাপন গৃহে প্রস্থান করিল।
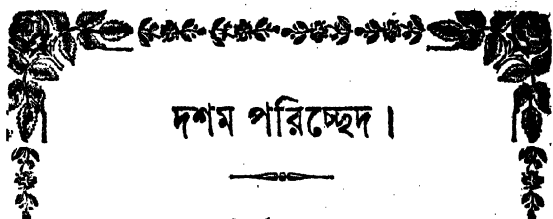
দশম পরিচ্ছেদ।

তীর্থ-ভ্রমণ।

যখন তীর্থভ্রমণে বা কোন কারণে বিদেশে যাইবার বাসনা জন্মে, তখন মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়। কখন্ নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইবে, কখন্ শুভযাত্রা করিয়া বহির্গত হওয়া যাইবে এই চিন্তাতেই মন আকুল, হইয়া উঠে। কিন্তু সংসারের মায়াবন্ধন এত সুদৃঢ় যে, সহজে তাহা ছেদন করিয়া বহির্গত হওয়া দুরূহ। রাধাকৃষ্ণ বাবু অতি কষ্টে কন্যাদ্বয়ের মমতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সহধর্ম্মিণীসহ তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। তিনি শুভক্ষণে যাত্রা করিয়া শ্রীরামপুর ষ্টেশনে উপস্থিত হন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি লোক ষ্টেশন পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়াছিল। গাড়ী আসিবার অনেক বিলম্ব দেখিয়া রাধাকৃষ্ণ বাবু সকলকেই সাদর সম্ভাষণে বিদায় প্রদান করিলেন।

শ্রীরামপুর ষ্টেশনটী দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে। দুই চারিখানি বেঞ্চপাতা আছে, আরোহীরা তাহার উপর বসিয়া বিশ্রাম করে। রাধাকৃষ্ণ বাবু তাহারই একখানি বেঞ্চের উপর বসিলেন, আর তাঁহার সহধর্ম্মিণী অদূরে এক কোণে দ্রব্যাদিপূর্ণ বাক্স লইয়া ভূমিতলে উপবেশন করিলেন।

ক্রমে ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। কেহ আসিয়া বেঞ্চে বসিতেছে,. কেহ বেড়াইতেছে, কেহ ছুটাছুটি করিতেছে। হঠাৎ একটী ঘণ্টার শব্দ হইবামাত্র সকলে চমকিত হইয়া উঠিলেন। সকলেরই বিশ্বাস হইল, গাড়ী আসিবার সময় হইয়াছে, সেই জন্য টিকিট গ্রহণের সঙ্কেত হইল। তাড়াতাড়ি কতকগুলি লোক টিকিট ঘরের গবাক্ষে গিয়া দেখিলেন, তখনও পর্য্যন্ত দ্বারবন্ধ রহিয়াছে। অগত্যা সকলেই ফিরিয়া আসিলেন।

ইত্যবসরে অবগত হওয়া গেল যে, কোন্নগর হইতে মালগাড়ী ছাড়িয়াছে। এই গাড়ী চলিয়া যাইবার অর্দ্ধঘণ্টা পরেই পশ্চিমযাত্রীদিগের ট্রেণ আসিবে। রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কাজে মনোনিবেশ করিল। গাড়ী আসিবার পূর্ব্বে ষ্টেশনে যেরূপ চিহ্ন প্রদর্শন করিতে হয়, তৎসমস্তই যথাযথরূপে সম্পন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ হস্তীর ন্যায় ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিতে করিতে ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত, দেখিতে দেখিতেই আবার অদৃশ্য!

রাধাকৃষ্ণ বাবু অনুগামী লোকজনদিগকে বিদায় দিয়া ভাল কাজ করেন নাই। এখন তাঁহার দ্বিগুণ চিন্তাবৃদ্ধি হইল। সঙ্গে দুই তিনটী মোট এবং স্ত্রীলোক রহিয়াছে। শ্রীরামপুর ষ্টেশনে পাঁচ মিনিটের অধিক গাড়ী দাঁড়ায় না। এত অল্প সময়ের মধ্যে একাকী বৃদ্ধলোক কি প্রকারে জিনিস পত্র তুলিবেন, কিরূপেই বা সহধর্ম্মিণীকে লইয়া স্বয়ং আরোহণ করিবেন, এই চিন্তাই তাঁহার অন্তঃকরণকে আকুলিত করিতে লাগিল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল। আবার

ঘণ্টার শব্দ শ্রুতিপথে প্রবেশ করিল। এইবার নিঃসন্দেহ টিকিট লইবার সঙ্কেত জানিয়া সকলেই ধাবমান হইল। যেরূপ জনতা, তাহাতে সহজে টিকিট ক্রয় করাও দুরূহ। রেলওয়ে কোম্পানির প্রায় প্রতি ষ্টেশনেই টিকিট গ্রহণের এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয়। সময়ে সময়ে এমনও দেখা গিয়াছে যে, টিকিট লইতে না পারিয়া বিদেশীয় লোককে সেই ষ্টেশনেই রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছে। এ সব দিকে রেলওয়ে কোম্পানির চক্ষু একেবারেই অন্ধ।

সকলেরই টিকিট লওয়া হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণ বাবুও অতিকষ্টে দুইখানি টিকিট ক্রয় করিয়াছেন। তিনি টিকিট লইয়া যেমন প্লাটফারমের নিকট দাঁড়াইয়াছেন, অমনি তিন চারিজন খালাসী আসিয়া বলিল, "মহাশয় আপনার মোট মাট যদি গাড়িতে তুলিয়া দিতে হয় হুকুম করুন, আমরা প্রস্তুত আছি।" এই কথা শুনিয়া রাধাকৃষ্ণ বাবুর যাবতীয় চিন্তা বিদূরিত হইল। তিনি যে ভাবনায় এতক্ষণ ব্যাকুলিত ছিলেন, এখন তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। তিনি দুই আনা পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হইয়া একটী খালাসীকে নিযুক্ত করিলেন। সে বাক্স ও মোটমাট লইয়া দণ্ডায়মান রহিল।

দেখিতে দেখিতে গাড়ি আসিয়া উপস্থিত। নানাবিধ খাদ্য, চুরুট, দেশালাই, পানের খিলি, পাঁউরুটী প্রভৃতি লইয়া ব্যবসায়ীরা প্রতি গাড়ীর দ্বারে দ্বারে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে। রেলওয়ে কোম্পানীর বেতনভোগী ব্রাহ্মণ নীলবর্ণের পাগড়ী বান্ধিয়া জল লইয়া প্রার্থনামত আরোহী-দিগকে দিতে আরম্ভ করিল। রাধাকৃষ্ণ বাবু সহধর্ম্মিণীসহ গাড়ীতে উঠিলে খালাসী তাঁহার দ্রব্যাদি তুলিয়া দিল।

রাধাকৃষ্ণ বাবু তাহাকে দুই আনার পয়সা দিয়া বিদায় করিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সমস্ত আরোহীরা গাড়ীতে উঠিল। ট্রেণখানিও একটী মর্ম্মভেদী চীৎকার করিয়া পুনরায় ছুটিল। দেখিতে দেখিতে একেবারে অদৃশ্য!

দুই একটী ষ্টেশন পার হইতে না হইতেই রাধাকৃষ্ণ বাবুর চিত্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। কন্যাদ্বয়ের বিরহশোক অন্তরে উদিত হইয়া তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক যাতনা প্রদান করিল। দুই এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দুও তাঁহার অজ্ঞাতসারে পতিত হইল। পাছে সহধর্ম্মিণীর চিত্ত আকুলিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি আত্মভাব গোপন করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। ক্রমে প্রকৃতির নব নব শোভা দেখিতে দেখিতে তাঁহার চিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে প্রকৃতিস্থ হইল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী উপস্থিত হইল। এইস্থানে ট্রেণ অর্দ্ধঘণ্টা অবস্থিতি করে। আরোহীরা অনায়াসে আহারাদি করিয়া লয়, এবং যাহার যাহা কিছু ক্রয়ের আবশ্যক, ক্রয় করিতে পারে। এইস্থানে প্রতি গাড়ীতে আলোক প্রদত্ত হইল। আরোহীরা ইচ্ছামত নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া লইল। অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইলে গাড়ী পুনরায় শব্দ করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। কোন ষ্টেশনে তিন মিনিট, কোথাও বা পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিয়া সমস্ত নিশা অতিবাহন করিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় গাড়ী বৈদ্যনাথে আসিয়া উপস্থিত হইল। যাঁহারা বৈদ্যনাথ তীর্থে গমন করেন, তাঁহাদিগকে এইস্থানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় অন্য গাড়ীতে আরোহণ পূর্ব্বক বৈদ্যনাথ মন্দিরে গমন করিতে হয়। রাধাকৃষ্ণ বাবু বৈদ্যনাথের টিকিট গ্রহণ করিয়াছিলেন;

সুতরাং সে গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অন্য গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সস্ত্রীক দেবাদিদেব মহাদেবের বৈদ্যনাথতীর্থে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই বাসনা ছিল, দিন কয়েক বৈদ্যনাথে অবস্থিতি করিয়া তৎপরে অন্যত্র গমন করিবেন। সুতরাং একটী দ্বিতল গৃহে বাসস্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

বৈদ্যনাথ হিন্দুদিগের পরমতীর্থ। এ স্থানে ভগবান্ শশাঙ্কশেখরের অনাদিলিঙ্গ বিরাজমান। তদ্ভিন্ন আরও অনেক দেবমূর্ত্তি পরিশোভিত আছে। এই স্থানে স্নান, তর্পণ, জপ, পূজা ও শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিলে অসীম পুণ্যরাশি সঞ্চয় হইয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণ বাবু সস্ত্রীক হইয়া শাস্ত্রানুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক দীনদুঃখীগণকে বহু অর্থ প্রদান করিলেন।

ক্রমে দশদিন অতিবাহিত হইল। রাধাকৃষ্ণ বাবুর গৃহিণী আর অধিকক্ষণ বৈদ্যনাথবাসে বাসনা না করাতে অন্যত্র গমনের আয়োজন হইতে লাগিল। পরদিন তাঁহারা দ্রব্যাদি গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ট্রেণে উঠিয়া গয়াধামে যাত্রা করিলেন। এইস্থানেই হিন্দুদিগের নরকোদ্ধারের একমাত্র উপায়। এই-স্থানে গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে পিতৃপুরুষ সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখধামে প্রস্থান করেন। রাধাকৃষ্ণ বাবু যথাসময়ে গয়াধামে উপনীত হইয়া সস্ত্রীক শ্রাদ্ধাদি সুসম্পন্ন করিলেন। এইস্থানে একপক্ষ কাল অতীত হইল। অনন্তর তথা হইতে কাশীধাম যাত্রা করিলেন। এইস্থানে সুরধনী উত্তরবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। জাহ্নবী-তীরবর্ত্তিনী বারাণসীর অলৌকিকীশোভা সন্দর্শন করিলে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে। বোধ হয়, অমরাবতীর শোভাও

ইহার নিকট স্থান প্রাপ্ত হয় না। ভগবান্ বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তিমান হইয়া অন্নপূর্ণাসহ এইস্থানে বিরাজ করিতেছেন। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, কাশীধাম পৃথিবী হইতে পৃথক্, বস্তুতঃ ইহার পবিত্রতা দর্শনে কদাচ মানবলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মে না। রাধাকৃষ্ণ বাবু সহধর্ম্মিণীসহ একপক্ষ কাল এইস্থানে অবস্থিতি পূর্ব্বক অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর দর্শন, তর্পণ, শ্রাদ্ধ, কুমারীপূজা, সধবাপূজন প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিলেন। অনন্তর তথা হইতে বহির্গত হইয়া অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, বাল্মীকি-আশ্রম প্রভৃতি নানাতীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক সর্ব্বশেষে মোক্ষধাম ত্রিবেণীসঙ্গমস্থল পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগধামে উপনীত হইলেন। তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ, দেবদেবী দর্শন, সাধুসমাগম প্রভৃতি কারণে তাঁহার মন দিন দিন প্রফুল্ল ও পবিত্র হইতে লাগিল।
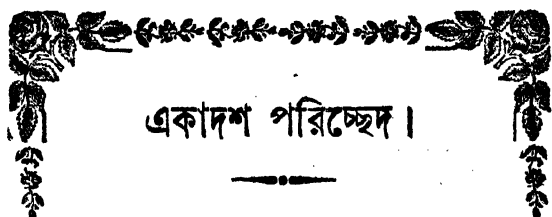
একাদশ পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্র বাবু।

কলিকাতায় বাহ্যিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যেমন অতি সঙ্কীর্ণ গলি ছিল, এখন আর প্রায়ই সে সমস্ত দেখা যায় না। চারিদিকেই অপেক্ষাকৃত বড় বড় রাস্তা বাহির হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল স্থানে তৈলের আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিত, এখন সেই সমস্ত স্থান আলোকমালায় সুশোভিত। যে সকল স্থানে অসংখ্য অসংখ্য খোলার ঘর দেখা যাইত, এখন সেই সমস্ত স্থান দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতি সুরম্য অট্টালিকায় পরিশোভমান। ফল কথা, পূর্ব্বাপেক্ষা মহানগরীর দৃশ্যশোভা যে দিন দিন অধিক বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

বাগবাজারের নিকটেই মালাপাড়া। মালাপাড়ায় অতি মনোহর একখানি দ্বিতল অট্টালিকা। বহির্ব্বাটীতেই বৈঠকখানা,—বৈঠকখানার মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ টেবিল, টেবিলের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি চেয়ার সুসজ্জিত। চারিদিকে দেয়ালে দেয়ালগিরী এবং উপরে একখানি টানাপাখা। ফল কথা, ঘরটী পরিপাটীরূপে সজ্জিত,—দেখিলেই বিলাসী পুরুষের গৃহ বলিয়া বোধ হয়। পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন

যে, যখন বৈঠকখানার দেয়ালে দেয়ালগিরী রহিয়াছে, তখন খানকয়েক ছবি থাকিলেই প্রকৃতপক্ষে সুদৃশ্য হইত। একথা সত্য, আমিই বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সে বিষয়েরও ক্রটী নাই। যাঁহার বৈঠকখানা, তিনি নিতান্ত বেরসিক নহেন। দেয়ালের চারিদিকেই নানারঙ্গের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিলাতী ছবি সুসজ্জিত।

দেবদেবীর প্রতি যাঁহাদিগের ভক্তি আছে, তাঁহারা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিতেই গৃহ সজ্জিত করিতে ভালবাসেন, যাঁহারা রসিকলোক, তাঁহারা নানারূপ রঙ্গের ছবি দিয়া ঘর সাজাইয়া থাকেন। আর যাঁহারা ডাক্তার তাঁহাদিগের গৃহে আরও চমৎকার দৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। হয় ত একদিকে মস্তকবিহীন মনুষ্যকঙ্কাল শোভা পাইতেছে, আবার হয় ত আর একদিকে হস্তশূন্য মস্তক বিশিষ্ট দেহ বিরাজ করিতেছে। যে যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহার গৃহ সেই ভাবেই সজ্জিত দেখা যায়।

যে বাড়ীখানির কথা বলা হইল, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইহার অধিকারী। তিনি ডাক্তার, অল্পবয়সে ডাক্তারী চিকিৎসার বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছেন। ইনিই রাধাকৃষ্ণ বাবুর দ্বিতীয় কন্যা শশীমুখীর স্বামী। নীরদ বাবুর সহিত নরেন্দ্র বাবুর কি সম্বন্ধ, পাঠক মহোদয়গণ এতক্ষণে তাহা বিদিত হইলেন। শশীমুখী এখন নরেন্দ্র বাবুর গৃহ আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন।

নরেন্দ্র বাবুর পিতামাতা বৃদ্ধ। তদ্ব্যতীত তাঁহার সংসারে দুইটী বিধবা ভগ্নী ও একটী ভাগিনেয় আছে। ভাগিনেয়ের নাম পদ্মলোচন, কিন্তু বাবুর ভাগিনেয় বলিয়া সকলে পদ্মবাবু বলিয়া সম্বোধন করে। পদ্মবাবু জননীর আদরের

সন্তান। অল্পবয়সেই পিতার মৃত্যু হয়, সুতরাং জননী পিতৃ-গৃহে থাকিয়াই শিশুটীকে লালন-পালন করিয়া আসিতেন। জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বলিয়া নরেন্দ্র বাবুও বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন।

পদ্মলোচনের গুণের পরিসীমা নাই, বাগ্‌দেবীর সঙ্গে তাঁহার চিরবিবাদ। পদ্মলোচন এখন নবযুবা। পদ্মলোচনের কথাগুলি অতি সুমধুর।—ত থ দ ইত্যাদি কতকগুলি বর্ণ তাহার মুখে উচ্চারিত হয় না, পদ্মবাবু তৎপরিবর্ত্তে ট উচ্চারণ করে। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাক্যই অনুনাসিক উচ্চারণ হয়। কতকগুলি কুচরিত্র বালকের সঙ্গে পদ্মলোচনের প্রণয়। পদ্মলোচন দিবারাত্রি অত্যুত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সেই সকল বালকের সহিত বেড়ায়। নরেন্দ্র বাবু অনেক চেষ্টাতেও তাহার সে সমস্ত দোষ দূর করিতে পারেন নাই।

নীরদ বাবু যেরূপ স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, নরেন্দ্র বাবুও তদপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন নহেন। কালের কুটিল গতিতে কলিযুগে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিকেই স্ত্রৈণ হইতে দেখা যায়। তবে পাঠকবর্গ বলিতে পারেন যে, কলিযুগে কেন, পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগেও এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। রাজা দশরথ স্ত্রীর বাক্যে প্রিয়পুত্রকে বনবাস দিয়াছিলেন, তিনি কি স্ত্রৈণ নহেন? রঘুপতি রামচন্দ্র সীতার জন্য বনে বনে রোদন করিয়া শেষে কপিকটক সহায়ে তাহার উদ্ধার সাধন করেন, তাঁহাকে কি স্ত্রৈণ বলা যায় না? ইহার উত্তর এই যে, দশরথকে স্ত্রৈণ বলিলেও বলা যাইতে পারে, কিন্তু রামচন্দ্রের প্রতি সে দোষারোপ নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। তিনি স্ত্রৈণ হইলে কদাচ গর্ভবতী রমণীকে বনবাসে বিসর্জ্জন

করিতেন না। রাজা জয়সেন স্বীয় পত্নী দুর্লভার পরামর্শে প্রিয়পুত্র বিজয় সেনের শিরশ্ছেদনের আদেশ দেন, বরং তাঁহাকে প্রকৃত স্ত্রৈণ বলা যায়। ফল কথা, স্ত্রৈণ ব্যক্তিদিগের অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ আছে।

নরেন্দ্র বাবু যদিও স্ত্রীর বাধ্য, স্ত্রীর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন সত্য, কিন্তু পিতামাতায় প্রতি তাঁহার ভক্তি অচলা। শশীমুখী বহুদিন পিতামাতার ও ভগিনী বসন্তলতার সংবাদ না পাওয়াতে একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পত্র লিখিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। শশীমুখীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নরেন্দ্র বাবু পত্র লিখিবার জন্য অন্তঃপুর হইতে যেমন বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি সম্মুখে ডাক-হরকরা উপস্থিত হইয়া বাবুর হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। নরেন্দ্র বাবু পত্রখানি খুলিবামাত্র দেখিলেন, নীরদ বাবুর লেখা। তৎক্ষণাৎ পত্রখানি হস্তে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঘোরবিপদ!—জলমগ্ন।

রাজনগরে ঘোর বিপদ উপস্থিত!—ঘরে ঘরে বসন্তের আবির্ভাব! গ্রাম প্রায় লোকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেই গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পুত্রকলত্রাদিসহ স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছে। নীরদ বাবু গ্রামস্থ আত্মীয় বন্ধুগণের বাড়ীতে বাড়ীতে যাতায়াত পূর্ব্বক তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

একদিন তিনি বাটীতে প্রত্যাগত হইয়াই দেখিলেন, বসন্ত-লতা শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। অসময়ে শয়নের কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে বসন্ত উত্তর দিলেন, "ভয়ঙ্কর জ্বর।" শ্রবণমাত্র নীরদ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া দেখিলেন, প্রজ্জ্বলিত বহ্নিতে যেন দগ্ধ হইতেছে। দেখিতে দেখিতে বসন্ত-লতা অচেতন! নীরদ বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ হীরার মাকে ডাকিয়া আনিলেন। হীরার মা আসিয়া বসন্তের নিকট গমন পূর্ব্বক "বৌদিদি বৌদিদি" বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিল। বৌদিদি নিরুত্তর। কে উত্তর দিবে? হীরার মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিপদকাণ্ডারী মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিল। নীরদ বাবু আর অশ্রুসম্বরণ করিতে

পারিলেন না। তিনি হীরার মাকে বাটীতে রাখিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। অবিলম্বে ডাক্তারের সহিত প্রত্যাগত হইলে চিকিৎসক বসন্তের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "নীরদ বাবু! জ্বর ভয়ঙ্কর বটে, কিন্তু কোন আশঙ্কা নাই। তবে পূর্ণগর্ভা অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। দুই চারিদিন এইভাবে থাকুক, পরে যাহা বিবেচনা হয়, করা যাইবে।" ডাক্তার বাবু এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

সহসা বসন্তের পীড়ার কথা শুনিয়া বামুন দিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রোগে বিপদে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া সাহায্য করিতে বামুন দিদি কখন কাতর হইতেন না। হীরার মা ও বামুন দিদি উভয়ে বসন্তের নিকট থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

তিনদিনের পর বসন্তের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি চক্ষুঃ উন্মীলন করিলেন, দুই একটী কথাও ধীরে ধীরে তাঁহার মুখ হইতে বহির্গত হইল। তদ্দর্শনে নীরদ বাবু কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন। এই সময়ে একবার ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া উচিত বিবেচনায়, নীরদ বাবু স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

বিধির বিধান—তাঁহার অচিন্তনীয় লীলা বুঝিয়া উঠা অতীব সুকঠিন। আজি যাহার প্রতি সদয়, কালি আবার তৎপ্রতি প্রতিবাদী। এই মুহূর্ত্তে যাহাকে আনন্দ জলধির প্রবল তরঙ্গে সন্তরণ করাইতেছেন, পরক্ষণেই তাহাকে আবার অতল বিষাদহ্রদে নিমগ্ন হইতে দেখা যাইতেছে। নীরদ বাবু ডাক্তারকে সংবাদ দিয়া, প্রত্যাগত হইবামাত্র দেখিলেন, বামুন দিদি ব্যস্তসমস্ত হইয়া একবার বাহিরে

আসিতেছে, আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তদ্দর্শনে উৎকণ্ঠিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বামুন দিদি কহিলেন, "বৌদিদি আবার কেমনতর হয়ে উঠেছেন। কেবল ছট্ ফট্ কোচ্চেন, আর তোমাকে দেখ্‌বার জন্য উতলা হয়েছেন।" শুনিবামাত্র আবার নীরদের মুখ কালিমায় ঢাকিয়া পড়িল। তিনি দ্রুতগতি বসন্তের নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি শয্যা লুণ্ঠিত হইয়া একবার চক্ষু উন্মীলন করিতেছেন, আবার মুদ্রিত করিতেছেন। নীরদ বাবু নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসন্ত! অসুখ কি কিছু বেশী বোধ হয়েছে।"

চারিদিবস দারুণ জ্বরভোগ করিয়া বসন্ত-লতা একান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। ধীরে ধীরে ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "তুমি আমার কাছে বসো। আমার অনেকগুলি কথা আছে। তোমায় একটী প্রতিজ্ঞা কর্ত্তে হবে।"

নীরদ বাবু শয্যার একপার্শ্বে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বসন্ত! কি প্রতিজ্ঞা? তোমার কথা রাখ্‌বো, তার আবার বাধা কি? আমি ত তোমার কথার ভাব কিছু বুঝ্‌তে পাল্লেম না।"

বসন্ত কহিলেন, "দেখ, আমি বোধ হয় আর বাঁচ্‌বো না। তবে তোমার হাত ধরে এই অনুরোধ কচ্চি, আমার বিয়োগে যেন তুমি হতাশ হইও না, তুমি পুনরায় বিবাহ কোরে সুখী হইও।"

বসন্তের মুখে এই দারুণ নির্ব্বেদবাক্য শুনিয়া নীরদের পদ্মনেত্র হইতে দর্ দর্ ধারায় অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অনতিবিলম্বেই

বামুন দিদি তাড়াতাড়ি নীরদের নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবু! শীঘ্র ডাক্তার আনুন, আর বুঝি বৌদিদিকে বাঁচাতে পাল্লেম না।"

নীরদ বাবু চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় থর্ থর্ করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্ত-মাত্র বিলম্ব না করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ডাক্তারের গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। অবিলম্বে ডাক্তারের বাটীতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তিনি রোগী দেখিতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। তখন নীরদ বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিকিৎসকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একে বর্ষাকাল, ঘন ঘন মেঘগর্জ্জন হইতেছে, তাহাতে সন্ধ্যার প্রাক্কাল। এখনও পর্য্যন্ত ডাক্তার গৃহে প্রত্যাগত হইলেন না। নীরদ বাবুর চিত্ত একান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। অনুসন্ধানে জানিলেন যে, ডাক্তার বাবু নদীর পরপারে গমন করিয়াছেন। নীরদ বাবু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, পীড়ার প্রবলতার প্রারম্ভে যদি উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ না হয়, তাহা হইলে রোগী মৃত্যুর মুখে পড়িবার সম্ভব। হায়! আর বুঝি বসন্তকে বাঁচাইতে পারিলাম না। জগদীশ্বর! তাই কি হবে!—যদি তাহাই হয়, যদি সত্য সত্যই বসন্ত আমার মায়া পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহা হইলে আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব? উঃ! বসন্তের মৃতদেহ! প্রিয়তমার নিস্পন্দ শরীর! তাহা আমি কখনই দেখিতে সমর্থ হইব না। তদপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল।

নীরদ বাবু এইরূপ দুশ্চিন্তায় একান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। ক্রমে রাত্রি অন্ধকারময় হইয়া পড়িল। তখন তিনি ধীরে ধীরে নদীর দিকে অগ্রসর হইলেন। মনে

করিলেন, ডাক্তার বাবু পরপার হইতে আগমন করিবামাত্র তাঁহাকে লইয়া যাইবেন।

বর্ষাকাল, তরঙ্গিণী বেগবতী। কল কল স্রোতে জলরাশি সবেগে প্রবাহিত হইতেছে। নীরদ বাবু ঘাটে উপস্থিত হইয়া মাঝিদিগকে অনুসন্ধান করিলেন, দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মনে মনে সংকল্প ছিল, পর-পারে গিয়া ডাক্তারের অনুসন্ধান করিবেন, কিন্তু সে আশা বিফল হইল। তিনি নদীকূলে দাঁড়াইয়া অপর পারের দিকে নেত্রপাত করিয়া রহিলেন। অনতিবিলম্বেই পর-পারে একটী ক্ষুদ্র আলোক দৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে বিবেচনা করিলেন, এইবার ডাক্তার বাবুর আগমন হইতেছে। এই ভাবিয়া যেমন তিনি অধিকতর জলপ্রান্তে অগ্রসর হইলেন, অমনি হঠাৎ মৃত্তিকা স্তূপ ভগ্ন হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে তিনি সেই মৃত্তিকারাশিসহ স্রোতস্বতীর বেগবতী তরঙ্গ মালার গর্ভে নিপতিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন, তাহা সেই অন্তর্যামী জগদীশ্বর ভিন্ন আর কে বলিতে পারে? দুরন্ত কাল সেই ঘোর বিপদের সময় তাহার কুটীল গতির পরিচয় দিল!
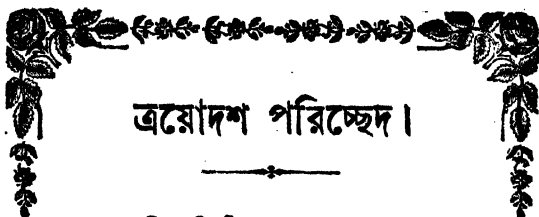
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিষাদিনীর আশ্রয়লাভ।

বিপদের সময় সকলেরই ভ্রম উপস্থিত হয়। যে হীরার মা পদে পদে—পলকে পলকে হরিনাম করে, বৌদিদির অবস্থা দেখিয়া আজি তাহারও আর সে নাম স্মরণ নাই। সে বসন্তের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া নিদ্রাবেশে ঢুলিতেছিল। অকস্মাৎ তন্দ্রাযোগে দেখিল যেন, সেই সন্ন্যাসী যাহাকে মোহনগড়ের বটমূলে দেখিয়াছিল, যাঁহার কৃপায় বসন্ত গর্ভবতী, সেই সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন, "ভয় কি ? সুধামাখা হরিনাম কর্, তোর বৌদিদি আরোগ্যলাভ করিবে।" স্বপ্ন দেখিবামাত্র সে চমকিয়া উঠিল, মুখে মধুমাখা হরিনাম করিয়া জীবন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল, বামুন দিদির সঙ্গে হরিপ্রসঙ্গ লইয়া নানারূপ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

বসন্ত অচৈতন্য! নীরদ বাবুও এতাবৎকাল গৃহে প্রত্যাগত হইলেন না, চিন্তানলে হীরার মা ও বামুন দিদি যার পর নাই আকুল হইয়া উঠিল। বর্ষাকাল, অন্ধকার রজনী, গৃহমধ্যে একটীমাত্র সামান্য প্রদীপ জ্বলিতেছে। এ অবস্থায় নীরদ বাবুর অন্বেষণে যাইবে, এরূপ কেহই নাই।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল। সহসা বসন্ত চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি যেন পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল যেন কিছু অনুসন্ধান করিতেছেন, যেন কোন প্রিয়বস্তু হারাইয়া, তাঁহার মন একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। হীরার মা সেইভাব দেখিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে তাঁহাকে শয়ন করাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বসন্ত কিছুতেই শয়ন করিলেন না। তখন বামুন দিদি মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, "বৌদিদি! অমন কচ্চো কেন ভাই? একটু শোও না।"

বামুন দিদির এই কথা শুনিয়া বসন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "বামুন দিদি! তোমার দাদাবাবু কোথা?"

"তোমার জরবৃদ্ধি দেখে সন্ধ্যার সময় ডাক্তারের বাড়ী গেছেন, কিন্তু এখনও বাড়ীতে ফিরে আসেন নি।"

বামুন দিদির মুখে এই কথা শুনিবামাত্র বসন্তের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কপালে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। জ্বর-যন্ত্রণায় যিনি চারিদিবস অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন, আজি তাঁহার হৃদয় যেন বিরহযন্ত্রণা দগ্ধ করিতে লাগিল। পাঠক মহাশয়েরা বোধ হয়, বসন্তের এ ভাব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই? রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বসন্তের জ্বরত্যাগ হইয়াছে। তিনি তন্দ্রাযোগে স্বপ্ন দেখিয়াছেন যেন, তাঁহার হৃদয়েশ্বর তাঁহারই শোকে বিহ্বল হইয়া, অগাধ সলিলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। স্বপ্ন দর্শনমাত্র তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

হীরার মা ও বামুন দিদি নানারূপ প্রবোধবচনে বসন্তকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার

হৃদয় প্রবোধ মানিল না। রোদনে রোদনেই সেই দুঃখনিশা অতিবাহিত হইল।

প্রভাত হইবামাত্র বামুন দিদি ডাক্তারের বাটীতে গিয়া সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলে সকলেই যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। ডাক্তার বাবু তৎক্ষণাৎ কতিপয় অনুচর সমভি-ব্যাহারে নীরদ বাবুর বাটীতে সমুপস্থিত হইলেন। আহা! পতিশোক অপেক্ষা নারীজাতির মর্ম্মান্তিক যাতনাকর দুঃখ জগতে আর কিছুতেই হইবার সম্ভব নাই। যে যুবতী ডাক্তারকে দেখিয়া লজ্জাবশে অবগুণ্ঠনাবতী থাকিতেন, আজি আলুলায়িতকেশে সর্ব্বজন সমক্ষে ধরাবিলুণ্ঠিত হইতে-ছেন। ভীষণ শোকসাগরে তাঁহার হৃদয়তরী প্রবল চিন্তা-ঝটিকায় সমাকুল হইতেছে।

গর্ভবতী অবস্থায় শোকতাপ একান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। তদ-বস্থায় অন্তর শোকাকুলিত হইলে গর্ভস্থ শিশুর বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভব। এই সকল উপদেশ দিয়া ডাক্তার মহাশয় বসন্তকে নানারূপে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগি-লেন। হীরার মা ও বামুন দিদি উভয়ে চিত্তবেগ সম্বরণ করিয়া ভাবী শিশুর মঙ্গলার্থ তাহাদিগের বৌদিদিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু ও অপরাপর লোকেরা কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন বসন্তের দেহে বিরহ-শোক ব্যতীত অন্য রোগের চিহ্নমাত্রও নাই। কে রক্ষণা-বেক্ষণ করে, কে বিপদে উদ্ধার করে, এই সংসারচক্রে কেই বা অভিভাবক হইবে, এই সমস্ত ভাবনায় হীরার মা ও বামুন দিদির অন্তর বিচলিত হইয়া উঠিল।

সংসারে কর্ম্মফল খণ্ডন হইবার নহে। যে যেরূপ কর্ম্ম

করে, তাহাকে তাহার সমুচিত ফলভোগ করিতে হয়। যাহারা অবিবেচক ও অদূরদর্শী, তাহারাই ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে। পরন্তু জগৎপিতা পক্ষপাতী নহেন, তিনি সকলের প্রতিই সমস্নেহে দর্শন করিয়া থাকেন। হীরার মা ও বামুন দিদি বসন্তকে অনন্যোপায় দেখিয়া চিন্তা করিতেছে, সহসা কলিকাতা হইতে নরেন্দ্র বাবু গিয়া উপস্থিত হইলেন। বসন্ত জ্বরাক্রান্ত হইলে নীরদ বাবু কলিকাতায় নরেন্দ্র বাবুকে পত্র দিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ডাকহরকরা নরেন্দ্র বাবুকে যে পত্রখানি দেয়, যে পত্রখানি হস্তে করিয়া তিনি প্রিয়তমা শশীমুখীর নিকট সংবাদ দিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, সেইখানিই নীরদ বাবুর লেখনী। সেই পত্র পাইয়াই শশী-মুখীর অনুরোধে নরেন্দ্র বাবু রাজনগরে উপস্থিত হইয়াছেন।

নরেন্দ্র বাবুকে দেখিবামাত্র বসন্তের শোকসাগর অধিকতর উদ্বেল হইয়া উঠিল। হীরার মার মুখে নরেন্দ্র বাবু যাবতীয় বিষাদঘটনা অবগত হইলেন। তখন তিনি অবিলম্বে বহুল অর্থ পুরস্কার স্বীকার করিয়া নীরদের অনুসন্ধানার্থ চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বহু অন্বেষণেও কোন ফল দর্শিল না।

দেখিতে দেখিতে চারি পাঁচদিবস অতিবাহিত হইল। নরেন্দ্র বাবু শশীমুখীকে পরিত্যাগ করিয়া আর অধিক দিন কিরূপে রাজনগরে অবস্থিতি করিবেন? এদিকে বসন্তকেই বা একাকিনী কি প্রকারে রাখিয়া যাইবেন, কে তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে? অগত্যা বসন্তকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই ধার্য্য হইল। হীরার মা ও বামুন দিদি উভয়ে কলিকাতায় গিয়া বসন্তের পরিচর্য্যা করিবে। শুভদিন স্থির

হইল, নরেন্দ্র বাবু নীরদের সমস্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ করতঃ গ্রামস্থ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া বসন্ত সমভিব্যাহারে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। অগত্যা ভগ্নীর অধীনেই বিষাদিনীর আশ্রয়লাভ হইল।
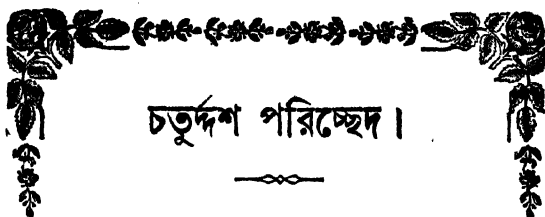
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সহমরণ।

পাঠক মহাশয়েরা অনেকদিন রাধাকৃষ্ণ বাবুর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। আমিও এতদিন তাঁহার অনুসন্ধান লইতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সুতরাং আপনাদিগকেই বা কিরূপে সংবাদ দিব? এখন তাঁহার সন্ধান পাইয়াছি। তিনি তীর্থ হইতে তীর্থান্তর ভ্রমণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীকাশীধামে আসিয়া বাস করিতেছেন। একে বৃদ্ধাবস্থা, তাহাতে পর্য্যটনের পরিশ্রম, পথিমধ্যেই তাঁহার জ্বর হয়। তিনি পীড়িত হইয়া সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে কাশীতে উপস্থিত হইয়াছেন। এখানে আত্মীয় স্বজন কেহই নাই, তাহাতে পীড়া, বৃদ্ধা যার পর নাই ভাবিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে জ্বর প্রবল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা একজন চিকিৎসক আনাইলেন। এবং অবিলম্বে দুইখানি পত্র লিখিয়া ডাকযোগে জামাতাদ্বয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

দিন দিন রোগের উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। চিকিৎসক দিন দিন ঔষধ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রোগী উত্তরোত্তর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকিল। জামাতাদ্বয়ের কেহই উপস্থিত না

হওয়াতে বৃদ্ধা একান্ত ব্যাকুলিতা হইয়া উঠিলেন। যাহা-দিগকে জগতের সারবস্তু জ্ঞানে সমস্ত বিষয়াদি সমর্পণ করিলেন, অসময়ে তাহারা একবার দৃষ্টিপাতও করিল না, এই ভাবিয়া সংসারের প্রতি বৃদ্ধার অসীম ঘৃণাসঞ্চার হইল।

ক্রমে একপক্ষ অতীত হইল। আজি ষোড়শ দিবস। জ্বর ভীষণ বৃদ্ধি, রোগী একেবারে চেতনাহীন! চিকিৎসক আসিয়া রোগীর বাহ্যিকভাব দর্শনমাত্রই হতাশ হইয়া পড়িলেন, তথাপি একবার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ বিকৃত হইল। সেই ভাব দর্শনে বৃদ্ধার অন্তর বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চিকিৎসক দেহের অনিত্যতা ও জগতের বিনশ্বরতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া প্রবোধবচনে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ক্রমে বিভাবরী সন্ধ্যাদেবীকে অগ্রসর করিয়া হাসিতে হাসিতে—নাচিতে নাচিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক-জন বৃদ্ধাকে চিরদুঃখিনী করিবার জন্যই যেন তাঁহার এত হাসি এত নৃত্য। যামিনী যেন বৃদ্ধাকে রোদন করিতে দেখিয়া হাস্যচ্ছলে ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা অতীত হইল। বৃদ্ধ রাধাকৃষ্ণ বাবু ক্রমে নিস্পন্দ হইতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় যেন ঊর্দ্ধভাগে সমুত্থিত হইল, শরীর অবশ হইতে লাগিল। ক্রমে বাক্‌শক্তিও তিরোহিত হইল। তাঁহার বিকট দৃশ্য দর্শনে বৃদ্ধার অন্তর একান্ত ভীত হইয়া উঠিল।

দুঃখের রাত্রি শীঘ্র প্রভাত হয় না। এই ভয়ঙ্কর নিশাথিনী পুনঃপ্রভাতা হইবে কি না, বৃদ্ধা কেবল তাহাই চিন্তা

করিতে লাগিলেন। তিনি শয্যার একপার্শ্বে বসিয়া অধো-বদনে অশ্রুপাত করিতেছেন, আর একবার আসন্ন মৃত্যু পতির দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চমকিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, জটাজূটমণ্ডিত একটী কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় পুরুষ যষ্টিহস্তে করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সে পুনঃ পুনঃ তাঁহার পতির জীবন প্রার্থনা করিতেছে। দর্শনমাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদজলে অভিষিক্ত হইল, তিনি চীৎকারস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে সে মূর্ত্তি অদৃশ্য। তখন তিনি পতির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, মুখ-খানি কালিমায় আবৃত, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, নাসিকার অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র এবং করপদ নিস্পন্দভাবে লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে শশব্যস্তে স্বামী অঙ্গে হস্তার্পণ করিবামাত্র হিমকরকা সদৃশ সুশীতল বোধ হইল। নাসারন্ধ্রের নিকট হস্ত দ্বারা দেখিলেন, আর শ্বাসবায়ু বহির্গত হইতেছে না। তখনই বুঝিতে পারিলেন, কালপুরুষ এতক্ষণে তাঁহার চির-আরাধ্য পতিদেবের প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

তামসী নিশায় জনমানববিহীন বাটীর মধ্যে মৃতপতি ক্রোড়ে করিয়া একাকিনী বৃদ্ধা সতী অবস্থিত। এরূপ ভয়াবহ শোকাবহ ঘটনা যে কিরূপ বিস্ময়কর, তাহা পাঠকবর্গ অনা-য়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। একমাত্র পতিভক্তিই রমণীর সহায়। তিনি রোদন করিতে করিতে হৃদয়-কমলে পতিপদধ্যান পতিগুণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পতির জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও সংসার বাসনা বিদূরিত হইল। পতির সহিত সহমৃতা হইয়া জীবন পবিত্র করাই তাঁহার এখন একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি এখন তাহাই চরমপথ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বিধি যাহার প্রতি যে কার্য্যের ভার দিয়াছেন, শতসহস্র বিপদ হইলেও তাঁহাকে সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইবে। রজনী বিগতাপ্রায় দেখিয়া দিনমণি তাড়াতাড়ি উদয়াচলে গমন করিলেন। নিশানাথ আর প্রণয়িনী কুমদিনীর প্রেম-সুধাপান করিতে পারিলেন না। "আবার কালি দেখা যাইবে" বলিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গগণ স্ব স্ব নীড় পরিত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে চতুর্দ্দিকে উড্ডীয়মান হইল।

কাহার পক্ষে সুপ্রভাত, কাহার পক্ষে কু-প্রভাত। প্রভাত-বায়ু কাহাকে যে কি সংবাদ দিবে, তাহা সেই অন্তর্যামী নিয়ন্তাই অবগত আছেন। কাশীধামে শবদাহনার্থ চিন্তা করিতে হয় না। উৎকট পীড়া হইলে প্রত্যহই তাহার বাটীতে সাধারণে সংবাদ লইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই শিবক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তাহার মৃতদেহ বাহন করিলে শিববহনের ফল হয় এবং তাহাকে দাহন করিলে অনন্ত-স্বর্গের পথ পরিষ্কার হইয়া থাকে। সুতরাং সকলেই শব-দাহনার্থ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। প্রভাতে তপনদেব সমুদিত হইবামাত্র পরম্পরায় অবগত হইয়া বৃদ্ধ রাধাকৃষ্ণ বাবুর সৎকারের জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মধুমাখা শিবরাম শিবরাম শব্দ করিতে করিতে বৃদ্ধের মৃতদেহ বহন পূর্ব্বক মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রস্থান করিলেন।

ইংরাজ বাহাদুরের অধিকারে হিন্দু প্রথা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। চিরপ্রচলিত নিয়মের শতাংশের একাংশও এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বকালে পতির মৃত্যু

হইলে হিন্দুমহিলারা সহমৃতা হইয়া সতীত্বের প্রকৃত নিদর্শন প্রদর্শন করিতেন। লর্ড বেণ্টিকের অধিকার হইতে সে প্রথা চিরবিলুপ্ত হইয়াছে। আমরা তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এরূপ অনেক যুক্তি পাওয়া যায় যে, সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকিলে আমাদিগের আর্য্যদেশের অনেক বিষয়ে অনেকাংশে মঙ্গলের সম্ভাবনা ছিল। যে আর্য্যজাতি প্রাচীনকাল হইতে বিদ্যায়—বুদ্ধিতে—যুক্তিতে সর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ মঙ্গলের চিহ্ন না দেখিয়া কদাচ এ প্রথা প্রচলিত করেন নাই। যাহা হউক, সে বিষয়ে আমাদের অধিক আন্দোলন করিবার অভিলাষ নাই। রাধাকৃষ্ণ বাবুর বৃদ্ধা স্ত্রী সহমৃতা হইবার বাসনা করিলেন; কিন্তু প্রকাশ করিলে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভব বিবেচনায়, মনোভাব হৃদয় মধ্যেই লুক্কায়িত রহিল।

পবিত্র মণিকর্ণিকাতীরে শবদাহনের আয়োজন হইল। রাধাকৃষ্ণ বাবুর অর্থের অভাব ছিল না, বৃদ্ধা বহু অর্থব্যয় করিয়া চন্দন কাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত করাইলেন। দীনদুঃখী প্রভৃতিকে ভূরিপরিমাণে অর্থ দান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। তাঁহার এইরূপ অলৌকিক দয়া দাক্ষিণ্যাদি দেখিয়া সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যথাবিধি চিতা প্রস্তুত হইল। হিন্দু প্রথা অনুসারে রাধাকৃষ্ণ বাবুকে স্নান ও নববস্ত্র পরিধান করাইয়া চিতার উপর শয়ন করাইল। অনন্তর বৃদ্ধা সপ্তবার চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া পতিমুখে অগ্নিপ্রদান করিলেন। চিতাগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া গগনমার্গ স্পর্শ করিল। তখন বৃদ্ধা মনে মনে পতিপদ ধ্যান করিতে করিতে চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অকস্মাৎ চিতানলে ঝম্ফপ্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে

হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল, কিন্তু তখন প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নির নিকটবর্ত্তী হওয়া একান্ত দুঃসাধ্য। কেহই রমণীকে উদ্ধার করিতে সাহসী হইল না। সংবাদ পাইয়া ইংরাজ-পুলিসের কর্ম্মচারীরা দ্রুতপদে আগমন করিল। কিন্তু আর কে কি করিবে, দেখিতে দেখিতে পতিপরায়ণা সতী রমণী পতি-ক্রোড়ে চিরসুখে নিদ্রিতা হইল।
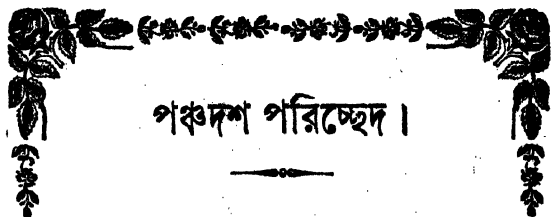
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নবকুমার।

আজি সাধে বাদ, আর সে পূর্ব্ব আমোদ নাই। যে বসন্ত-লতা দিবানিশি আনন্দ-সলিলে ভাসিতেন, হাসি-মুখ দেখিলে যাঁহার হৃদয়কমল প্রফুল্ল হইত, আজি সেই বসন্ত-লতা নিরানন্দ-হ্রদে সন্তরণ দিতেছেন। প্রায় তিন সপ্তাহ হইল, নীরদবাবু নিরুদ্দেশ। নরেন্দ্রবাবু কলিকাতায় আসিয়াও বহুসংখ্যক লোককে নীরদের অন্বেষণার্থ দেশ বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; সকলেই ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কাশী হইতে শ্বশুরের পীড়ার সংবাদ আসিয়াছে। নরেন্দ্রবাবুর চিত্ত এই সকল কারণে অতীব বিচলিত, কিন্তু তিনি এ সমস্ত ঘটনা বসন্ত-লতা বা শশীমুখী কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। বসন্ত-লতা একে স্বামী-শোকে পাগলিনী, তাহার উপর পিতার উৎকট পীড়ার কথা শুনিলে, একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িবেন; এই আশঙ্কাতেই নরেন্দ্র বাবু সমস্ত গোপন রাখিয়াছেন।

কলিকাতায় আসিবার সময় বসন্তের অনুরোধেই নরেন্দ্র বাবু হীরার মাকে ও বামুন দিদিকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

ইহারা সঙ্গে থাকিলে কথাবার্ত্তায় মনের অনেকটা শান্ত হইবার সম্ভব, বসন্ত-লতা এই উদ্দেশেই ভগ্নীপতির নিকট উঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে আনিতে অনুরোধ করেন। নরেন্দ্র বাবুর বাটীর নিকটেই একটী পৃথক্ বাটী ভাড়া হয়, সেই বাটীতেই বসন্ত-লতা এবং হীরার মা ও বামুন দিদি বাস করেন। নরেন্দ্রবাবু ও শশীমুখী সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। হীরার মা ও বামুনদিদি সর্ব্বক্ষণ বসন্তের নিকট থাকিয়া নানাকথায় তাঁহার চিত্ত-বিনোদনের চেষ্টা করে।

যে বাড়ীতে বসন্ত-লতা বাস করেন, তথায় দ্বারবান্ নাই, সুতরাং দরজা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে। কেহ কোন প্রয়োজনে আসিলে হীরার মা অথবা বামুনদিদি দরজা খুলিয়া দেয়। অন্য কোন ভয় নাই সত্য, কিন্তু পদ্ম-লোচনের জন্যই সকলে সশঙ্কিত। সুবিধা পাইলে পদ্ম-লোচন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অলক্ষিতে জিনিসপত্র আত্মসাৎ করিতে পারে। তাহার অসাধ্য কিছুই নাই।

একদিন নরেন্দ্রবাবু আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া অধোবদনে চিন্তা করিতেছেন, অকস্মাৎ হীরার মা আসিয়া উপস্থিত। তিনি হঠাৎ হীরার মাকে দেখিয়া, আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, "বৌদিদি একবার আপনাকে ডাকিতেছেন।"

"যাইতেছি" বলিয়া নরেন্দ্রবাবু হীরার মাকে বিদায় দিলেন। হীরার মা অগ্রসর হইল, অনতিবিলম্বেই নরেন্দ্র-বাবু বসন্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। বসন্ত-লতা তখন শয়ন করিয়া অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং গাত্রোত্থান করিয়া, নরেন্দ্রবাবুকে উচিত মত সাদর-সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না।

বসন্তের প্রসববেদনা উপস্থিত। পাঠক-মহাশয়দিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বসন্ত-লতা পূর্ণগর্ভা অবস্থাতেই পতিহারা হইয়াছেন। একে দুর্ব্বল, তাহাতে পতিশোকে মানসিক শক্তিরও হ্রাস হইয়াছে, তদুপরি আবার প্রসব-বেদনা উপস্থিত, সুতরাং যাতনার পরিসীমা নাই। নরেন্দ্র-বাবু প্রসববেদনা দর্শনে প্রবোধবাক্যে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ধাত্রীর নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। অনতিবিলম্বেই ধাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। নরেন্দ্রবাবু প্রসবকালীন সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিয়া বাটীতে গমন করিলেন।

যথাকালে শুভক্ষণে বিষাদিনী দুঃখিনী বসন্তের ক্রোড়-দেশ আলোকিত করিয়া কুমারবিনিন্দিত এক নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইল। হীরার মা হাসিতে হাসিতে নরেন্দ্রবাবুকে সংবাদ দিলে তিনি সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। নবকুমারের রূপের ছটায় সূতিকাগৃহ যেন আলোকিত হইয়াছে। শিশুর বদনারবিন্দ দর্শন করিবামাত্র নরেন্দ্রবাবুর নয়নযুগল হইতে বাষ্পবিন্দু নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে বসন্তলতা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এতদিনে তাঁহার সুখ-সূর্য্যোদয়ের আশা তিরোহিত হইয়াছে, আর বুঝি পতির অনুসন্ধান হইল না। নচেৎ নবকুমার দর্শনে নরেন্দ্রের অশ্রুপাত হইবে কেন? যাহা হউক, অতি কষ্টে শিশুর মুখপদ্ম দেখিয়া—তাহাকে লালনপালন করিয়া কোন-রূপে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রবাবু সুতনির্ব্বিশেষে স্নেহসহকারে কুমারের জাত-কর্ম্মাদি যাবতীয় সংস্কার যথাবিধি সুসম্পন্ন করিলেন। শিশু দিন দিন শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তাহাকে লালনপালন করিয়া—তাহার মুখ দেখিয়া বসন্তলতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাঁহার শরীরও দিন দিন নীরোগ ও সবল হইয়া উঠিল। যখন পতির কথা মনে পড়িত, তখনই তাঁহার হৃদয় জ্বলন্ত-অঙ্গারে দগ্ধ-বিদগ্ধ করিত; আবার নবকুমারের মুখপদ্ম দেখিলেই সকল যাতনা ভুলিয়া যাইতেন। এইরূপে কলিকাতার বাটীতেই দিনপাত করিতে লাগিলেন।
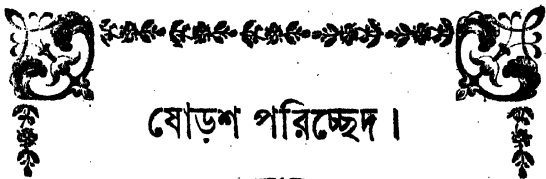
ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পদ্মলোচনের লীলা।

ফাল্গুন মাস। আর এখন শীতের অধিকার নাই, আর দেহে—সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্র জড়াইয়া থাকিতে হয় না। এখন নবীন বসন্তের নবোদয়! যুবক-যুবতীর হৃদয়পঙ্কজ আনন্দে উৎফুল্ল! কোকিলেরা শাখী-শাখার অন্তরালে বসিয়া কুহু কুহু রবে যুবক-যুবতীর মন মাতাইয়া তুলিতেছে। ফল কথা, যিনিই হউন না কেন, নবীন বসন্তোদয়ে সকলেরই অন্তর অপেক্ষাকৃত নবভাব ধারণ করিবে।

এই সময়ে মহানগরী কলিকাতার কোন স্থানে একটী উদ্যানমধ্যে বসিয়া চারি পাঁচটী নবযুবা পরস্পর কথোপকথন করিতেছে। আমাদিগের পদ্মলোচন বাবুও তাঁহাদিগের মধ্যে একজন; সুতরাং পাঠক-মহাশয়েরা সহজেই এই দলের স্বভাব-প্রকৃতি বুঝিতে পারিতেছেন। কথোপকথন করিতে করিতে একজন বলিয়া উঠিল, "ভাই! আজি একটু ভালরকম আমোদ করা চাই।" এই কথা শুনিয়া পদ্মলোচন একেবারে গলিয়া গেল।—মনে করিল, আজি সাধ মিটাইয়া বিলাসিনী-গৃহে সুরাপানাদি আমোদ-প্রমোদ হইবে। ইত্যবসরেই পূর্ব্বোক্ত যুবা পদ্মলোচনকে

লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ভাই! আজিকার খরচ পত্র সব তোমার।" এই কথা শুনিয়া পদ্মলোচনের মুখে যেন কালি ঢালিয়া দিল। প্রতিদিনই প্রায় ঐ সকল দলে মিশিয়া পদ্মলোচন বিনা ব্যয়ে আমোদ-প্রমোদ করে, আজি কোন্ মুখে একদিন খরচ করিতে অস্বীকৃত হইবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "আপনাড়া এখানে একটু অপেক্ষা কড়ুন। আমি টট্‌কোড়ে একবাড় বারী ঠেকে আসি।"

পদ্মলোচন তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া, তৎক্ষণাৎ মাতার নিকট গমন করিল। যে আশাতে জননীর নিকট আগমন, তাহা পাঠক-মহাশয়েরা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। পদ্মলোচনের জননী ভিন্ন আর ভরসা নাই, কিন্তু সে আশাও নির্ম্মূল হইয়াছে। জননীর হস্তে যে কিছু অর্থ ছিল, সহজে—বলে, নানারকমে পদ্মলোচন তৎসমস্তই নষ্ট করিয়াছে। এখন তাহার জননীকে দুই একটী পয়সার জন্যও নরেন্দ্রবাবুর নিকট হাত পাতিতে হয়। নরেন্দ্রবাবু জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে বিশেষ সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহার আবশ্যক-মত কিছু কিছু দিতেও কুণ্ঠিত হন না। পদ্মলোচন জননীর নিকট আসিয়াই তাড়াতাড়ি কহিল, "মা! আমাকে আড টাট্টে ট্যাকা দেও টো, ভাড়ী ডরকার আছে। আমি আবাড় টোমাকে ডোবো।"

জননী শুনিয়াই অবাক্!—কহিলেন, "সে কি! তুমি এখন চারটী টাকা নিয়ে কি কোরবে বাবা? আচ্ছা, দরকার হয়ে থাকে, কালি তোমার মামার কাছ থেকে চেয়ে দিব।"

"না—টা হবে না, আমাকে আড ডিটে হবে। না ডিলে তোমাকে ঘুসি ডেবো।"

"তা দেবে বৈ কি বাবা! তুমি আমার আহ্লাদের ছেলে,

প্রাণপণ কোরে খাইয়ে পরিয়ে তোমাকে মানুষ করেছি; এখন আমাকে না মারলে চল্‌বে কেন? হা আমার কপাল!”

জননীর কথা পদ্মলোচনের সহ্য হইল না। অমনি সে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিয়া উঠিল, “ডেম বেটী, যদি টাকা না ডিবি,—টো ডেক্‌বি। ফেড় বোল্‌ছি শীগ্‌গির ডে।”

“বাবা আমি টাকা কোথা পাব? যা ছিল, সকলই ত তুমি নিয়েছ।—থাক্‌লে কি দিতেম না? নাই, কোথা থেকে দিব?”

ক্রমে পদ্মলোচন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “টবে এই-বার মাড় খেলি ডেক্‌ছি।” এই বলিয়াই জননীকে পদাঘাত করিয়া পলায়ন করিল। তাহার জননী শিরে করাঘাত করিয়া “হা অদৃষ্ট! আমার কপালে এই ছিল? হতভাগা ছেলে! তুই আমাকে লাথি মার্‌লি?” এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পদ্মলোচন আবার ফিরিয়া আসিল। আবার চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া জননীকে বলিল, “ডেক্‌বি গুবেটী, ফেড় মাড়্‌বো, নৈলে টাকা ডে।” এই বলিয়া সবেগে বাক্স ভগ্ন করিয়া যাহা পাইল, লইয়া প্রস্থান করিল। তাহার জননী নিরুপায় হইয়া নানারূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া, তিরস্কার করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে পদ্মলোচন ত্বরিতগতি বন্ধুবর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, “ভাই! আমার আস্‌টে একটু ডেড়ী হয়েছে, মাপ কোড়ো।” পদ্মলোচনের এই কথা শুনিয়া যুবকদল বিবেচনা করিল যে, পদ্মলোচন নিশ্চয়ই আজিকার খরচের যোগাড় করিয়াছে। এই ভাবিয়া কহিল, “না না, তোমার একটু বিলম্ব হয়েছে, তা’তে আর ক্ষতি কি? যদি তুমি আজি টাকা নাই পেতে, তা হোলেও কি তোমার উপর আমরা রাগ্ কোত্তেম, না অসন্তুষ্ট হোতেম?”

ক্ষণকাল এইরূপ নানা কথোপকথনের পর পদ্মলোচন বাবু পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া, বন্ধুবর্গের সম্মুখে প্রদান করিল। জননীর বাক্স ভগ্ন করিয়া সে ঐ একটীর অধিক আর কিছুই প্রাপ্ত হয় নাই। একটীমাত্র টাকা দেখিয়া, দলের সকলেই অবাক্ হইয়া পড়িল। চারি পাঁচ জনের আমোদ-প্রমোদ কখন এক টাকায় হইতে পারে না। তখন যুবকদল কিছু অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, "ভাই পদ্মলোচন! তোমাকে আর কিছু আন্‌তে হবে, তা নৈলে কখনও চোল্‌বে না।"

পদ্মলোচন বলিল, "ভাই! টোমড়া আজ মাপ কড়ো, আমি আড় ডোগাড় কোট্টে পাড়িনি, টা হোলে অবীশ্যি আন্‌টেম্।"

"যেথানে পাও, তোমাকে আন্‌তে হবে।"—যুবকদল নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "যেথানে পাও, তোমাকে আন্‌তে হবে। তুমি ভাই রোজ রোজ আমাদের সঙ্গে আমোদ কর, এক দিনও একটী পয়সা দেও না। আজ না দিলে আমাদের সঙ্গে যেতে পাবে না।"

পদ্মলোচন হতাশ হইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "ভাই! আড আমাকে মাপ কড়ো, কাল আমি কিছু ডোগাড় কোড়ে ডেবো।"

পদ্মলোচনের এই কথা শুনিয়া দলের সকলেই বলিল, "আচ্ছা, এ টাকাটী আমাদের কাছে থাক, তুমি কালি আর চারিটী টাকা দিলে পর, আমোদ-আহ্লাদ হবে।" এই বলিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, পদ্মলোচনও চিন্তাকুলহৃদয়ে মৃদুমন্দপদসঞ্চারে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।
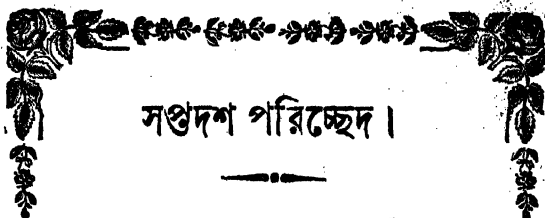
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

স্বভাব দোষ—অদ্ভুত চুরি!

জগতে এরূপ লোক দেখা যায় না যে, নারীজাতির মনোগত অভিসন্ধি বুঝিতে পারে। মনের মধ্যে দুরভিসন্ধি থাকিলে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া একান্ত দুরূহ। নতুবা মন্থরার মনে মনে যে তাদৃশ কু-অভিসন্ধি ছিল, তাহা কে বুঝিতে পারিয়াছিল? যদি তাহা প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে কদাচ রাজা দশরথ তাহাকে আপন পুরীমধ্যে স্থান দিতেন না। পদ্মলোচনের স্বভাব যে দিন কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে, নরেন্দ্রবাবু এতদিন তাহা বিশেষরূপ বুঝিতে পারেন নাই; বুঝিলে অবশ্য প্রতীকারের উপায় চেষ্টা করিতেন।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, বামুনদিদি পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, এখন সহরে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া আছেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার রং-তামাসার বিরাম নাই। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই হাস্ত-পরিহাসের ছটা। কলিকাতায় আসিয়া পদ্মলোচন বাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ পরিচয় হইয়াছে। তিনি প্রকৃত-পক্ষে পদ্মলোচনকে বিলক্ষণ ভাল বাসেন। বসন্তলতা যে বাটীতে থাকেন, সর্ব্বক্ষণই তাহার সদর দরজা বন্ধ থাকে। পদ্মলোচন আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিবামাত্র বামুনদিদি

দরজা খুলিয়া দেন, পদ্মলোচন আসিয়া তাঁহার সঙ্গে নানারূপ হাস্য-পরিহাসাদি কথোপকথন করিয়া, আবার ক্ষণবিলম্বে প্রস্থান করে। হীরার মা এ সকল দেখিতে ভালবাসে না। যে বাটীতে তিনটীমাত্র স্ত্রীলোকের বাস, সেস্থানে যে একজন পুরুষ মানুষ আসিয়া হাস্য-পরিহাস করে, হীরার মার চক্ষে তাহা যেন শূলবিদ্ধ বলিয়া অনুভব হয়। তবে নরেন্দ্রবাবুর ভাগিনেয়, সুতরাং মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না।

এদিকে পদ্মলোচন বাড়ীতে আসিয়া কি উপায়ে চারিটী টাকার সংগ্রহ হইবে, সেই চিন্তাতেই আকুল হইয়া উঠিল। হঠাৎ বামুনদিদির কথা তাহার মনে পড়িল। মনে করিল, ধারস্বরূপ বামুনদিদির নিকট হইতে চারিটী টাকা লইয়া আপাততঃ মান রক্ষা করা যাউক, পরে বামুনদিদির টাকা পরিশোধনের অন্য উপায় দেখা যাইবে। এই বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক একেবারে বসন্তের বাটীতে উপস্থিত হইল।

যে বসন্তের সুখের জন্য—হিতকামনায় হীরার মা দিবা-নিশি চিন্তিত থাকিত, আজি সেই বসন্তের ক্রোড়ে নব-শিশু দর্শনে হীরার মা একেবারে আনন্দে বিহ্বল হইয়া-গিয়াছে। সে রাত্রিকালে গৃহমধ্যে বসিয়া, বামুনদিদির ও বসন্তের সহিত নানারূপ কৌতুক করিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের নিশি,—অন্ধকার। গৃহমধ্যে যে একটীমাত্র প্রদীপ জ্বলিতে ছিল, বায়ু-হিল্লোলে তাহাও নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। কথোপকথনের ব্যাঘাত হয়—বাধা পড়ে বলিয়া হীরার মা আর প্রদীপ জ্বালিতে যায় নাই;—তত আবশ্যকও বোধ করে নাই। মনে মনে এই সঙ্কল্প ছিল যে, কথাবার্ত্তা শেষ

হইলে, একেবারে প্রদীপ জ্বালিয়া আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক সকলে শয়ন করিবে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, অকস্মাৎ মৃদু পদশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র হীরার মা সচকিতে গৃহদ্বারের প্রতি নেত্রপাত করিল। যদিও কৃষ্ণপক্ষের রজনী, তথাপি নক্ষত্রালোকে অনেকটা অস্পষ্ট দর্শনও হইয়া থাকে। হীরার মা দেখিল, যেন একটী মনুষ্যমূর্ত্তি একটী বাক্স হস্তে করিয়া পলায়ন করিতেছে। তখন তাহার চৈতন্যোদয় হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নরেন্দ্রবাবু বসন্তের তত্ত্বাবধান করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে আনন্দাতিরেক বশতঃ বিহ্বল হইয়া হীরার মা সে দিন সদর দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। সে নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিল যে, চোর বাক্স চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছে। তখন সে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া "বৌদিদি! সর্ব্বনাশ হয়েছে, চোরে সমস্ত চুরি করে নিয়ে গেল" বলিয়া, তৎক্ষণাৎ চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তখন চোর বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সদর রাস্তায় পড়িয়াছে, এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। হীরার মা এখন আর পূর্ব্বের মত নাই, সহরে থাকিয়া—সহরের চাল-চলন দেখিয়া অনেকাংশে চতুরা হইয়াছে। সে রাস্তায় আসিয়া চীৎকারস্বরে পাহারাওয়ালাকে ডাকিতে আরম্ভ করিল, এবং "চোর চোর" বলিয়া গগনভেদ করিতে লাগিল। অবিলম্বে পাহারাওয়ালা সম্মুখবর্ত্তী হইল, হীরার মা চোরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যেমন দেখাইয়া দিল, পাহারাওয়ালাও অমনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তস্করের হস্তধারণ করতঃ দুই এক ঘা শ্যামচাঁদ রামচাঁদ প্রদান করিল। তখন চোর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমাকে মার কেন?"

পাহারাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "তোম্ এ বাকস্ কাহাসে পায়া?"

"এ আমাড় বাক্সো, এটে আমাড় অনেক টাকা আটে—টুমি আমায় টেড়ে দেও" এই বলিয়া চোর বল প্রকাশ করাতে পাহারাওয়ালা উচ্চৈঃস্বরে তাহার জুড়িদারকে ডাকিতে লাগিল। অবিলম্বে দ্বিতীয় পাহারা-ওয়ালা হাজির। তখন বল প্রকাশ করা বিফল বিবেচনা করিয়া চোর পাহারাওয়ালার হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল;—বলিল, "আম্রাকে টেড়ে ডেও, এই বাক্সে যা আটে, আড্ডেক টোমাকে ডিট্টি।" এই কথা শুনিয়া পাহারাওয়ালারা নিঃসন্দেহ বুঝিল যে, চুরি করিয়াই বাক্স আত্মসাৎ করিয়াছে।

ইত্যবসরে হীরার মাও দৌড়াইতে দৌড়াইতে সেই স্থলে গিয়া উপস্থিত হইল। চোরকে দেখিয়াই হীরার মা অবাক্!—তাহার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গেল, তাহার মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল। সে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

পাঠক-মহাশয় বোধ হয় হীরার মার বিস্ময়ের কারণ বুঝিতে পারিয়াছেন। এ চোর অপর কেহই নহে, আমাদের সেই পদ্মলোচন বাবু। বামুন দিদির নিকট আসিবার সঙ্কল্প করিয়া যখন পদ্মলোচন বসন্ত-লতার দ্বারদেশে উপস্থিত হয়, তখন সদর দরজা উন্মুক্ত দেখিয়া ধীরে ধীরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। বসন্তলতার শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া দেখে যে, ঘরের ভিতরে তিনটী স্ত্রীলোক বসিয়া কথোপকথন ও হাস্য-পরিহাস করিতেছে। তাহারা এতদূর অন্যমনস্ক রহিয়াছে যে, প্রকৃত অচেতনপ্রায়

বলিলেই হয়। তদ্দর্শনে পদ্মলোচন উপযুক্ত অবসর ভাবিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। চতুর্দ্দিক্ অনুসন্ধান করিয়া প্রথমতঃ কিছুই প্রাপ্ত হয় না, পরে বাক্সটী হস্তে ঠেকিবামাত্র যেমন তাহা লইয়া প্রস্থান করিবে, অমনি হীরার মা নক্ষত্রালোকে দেখিতে পাইয়াছিল।

পদ্মলোচন নানাপ্রকার মিনতি করিয়া পাহারাওয়ালার পদধারণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। অধিকন্তু হস্তস্থ রুল দ্বারা প্রহার করতঃ কহিল, "চল্ আবি থানামে জানে হোগা।"

পদ্মলোচন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "ওমা গো!—আমি গেটি গো!—মেড়ে ফেল্লে গো!—টোমার নাটী মেড়ে ভাল কড়িনি মা!" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। পাহারাওয়ালারা তাহাকে ধাক্কা মারিতে মারিতে থানায় লইয়া চলিল। হীরার মা অবাক্ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বসন্ত-লতার ও বামুনদিদির বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা ও ভগিনী।

বর্দ্ধমানের রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ধনশালী ব্যক্তি। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি তাদৃশ ছিল না বটে, কিন্তু তিনি বহুদিবসাবধি পুলিস লাইনে সুখ্যাতির সহিত কর্ম্ম করিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন। এখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, নিয়মানুসারে মাসিক পেন্‌সন পাইয়া থাকেন। তাঁহার এক পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্রের নাম সুরেন্দ্র নাথ, কন্যাটীর সরোজিনী। রাধানাথ বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কন্যাটীকে যার পর নাই ভালবাসেন। কন্যাটী পুত্রের অনুজাতা।

রাধানাথ বাবু কিঞ্চিৎ জমিদারী ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা নগরীতে একখানি বাড়ীও ক্রয় করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই বাটীতে থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। সরোজিনী বালিকা, বিশেষ জনক-জননীর আদরের পাত্রী, সে দেশে তাহার পিতা-মাতার নিকটেই থাকে। রাধানাথ বাবু মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নানাদি উপলক্ষে যখন সস্ত্রীক কলিকাতার বাটীতে আগমন করেন, সরোজিনীও তখন সেই সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া থাকে। কলিকাতার বাটীতে

সুরেন্দ্রনাথের নিকট একটী পাচক ও একটী ভৃত্যমাত্র আছে। ফল কথা, বিদেশে থাকিলেও সুরেন্দ্রনাথের কোনরূপ কষ্টের সম্ভাবনা নাই।

রাধানাথ বাবুর প্রকৃতি কলিকাতার ধনীলোকদিগের স্থায় নহে। তিনি দশজনের সহিত মিষ্টালাপ ও দশ-জনের হিতচিকীর্ষা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার সমধিক আদর ও ভক্তি। তাঁহার বর্দ্ধমানের বাটীতে দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা, রাস, দোলযাত্রা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মই সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা সমাগতপ্রায়। শরৎ-সমাগমে ভূমণ্ডল একরূপ অভিনব মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। কি ধনী, কি নির্ধনী, কি বালক, কি যুবা সকলেই মহামায়া সন্দর্শনে সমুৎসুক। কলিকাতা-নগরীর শোভার পরিসীমা নাই। দোকানদারেরা তাহাদিগের বিপণিসকল মনোহর সাজে সাজাইয়া দর্শকবৃন্দের মন হরণ করিতেছে। যে সকল বিদেশীয় লোক কলিকাতায় চাকরী করেন, তাঁহাদের মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, আর কাজকর্ম্ম পূর্ব্বরূপ ভাল লাগে না। অনেকেই প্রত্যহ স্বপ্নের ঘোরে প্রিয়তমাকে দর্শন করেন। যেন প্রিয়তমা বলিতেছে, "নাথ! আমার এবার একখানি বারাণসী শাড়ী চাই।" অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, আর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছে। কেহ কেহ পুত্রের জন্য মনোহর মহামূল্য পোষাক, কেহ বা কন্যার জন্য নানাপ্রকার অলঙ্কার এবং কেহ কেহ বা চিত্তহারিণী বারাঙ্গনা বিলাসিনীর মনোরঞ্জনের উপায়ের জন্য চিন্তাকুল। ফল কথা, পূজা-সমাগমে সকলেরই মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে।

রাধানাথ বাবুর হৃদয় আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছে। জগন্ময়ী মহামায়া তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠান করিবেন, সেই উপলক্ষে বিদ্যালয় বন্ধ হইলে সুরেন্দ্রনাথ বাটীতে আসিবেন, এই আনন্দে রাধানাথ বাবু পুলকিত। তাঁহার হৃদয়-সরোজ আনন্দ-হিল্লোলে দুলিতে লাগিল।

সরোজিনীর বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসরমাত্র। সে জননীর মুখে শুনিয়াছে, তাহার দাদা কলিকাতা হইতে বাড়ীতে আসিবেন। সেই আনন্দে বালিকার হৃদয়ও উৎফুল্ল! সে নানারূপ ক্রীড়াদ্রব্য লইয়া খেলা করিতেছে, আর গুন্ গুন্ স্বরে "দাদা আস্‌বে, আমার জন্য কত খেলা আন্‌বে" বলিয়া আপন মনে গান করিতেছে। খেলিতে খেলিতে অমনি দৌড়িয়া জননীর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিল;—মধুমাখা আধ আধ কথায় জিজ্ঞাসা করিল, "মা! দাদা কবে আস্‌বে?" "কাল আস্‌বে" বলিয়া জননী তাহার বদনপদ্ম চুম্বন করিলেন। আবার বালিকা নাচিতে নাচিতে খেলা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ক্রমে শারদীয়া পূজার দিন সম্মুখবর্ত্তী। সকল আপিস, আদালত—বিদ্যালয় নিয়মিত দিনের জন্য বন্ধ হইল। সুরেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন। জনক-জননী বহু দিনের পর পুত্রমুখ দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সরোজিনী নাচিতে নাচিতে—হাসিতে হাসিতে "দাদা দাদা" বলিয়া সুরেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্র নাথ কাঁচের পুতুল, ছোট ছোট গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি ক্রীড়াদ্রব্য আনিয়াছিলেন। সেইগুলি সরোজিনীকে দিবামাত্র সে সকলকে তাহা দেখাইবার জন্য অমনি ছুটিল।

রাধানাথ বাবু পুত্র-কন্যাকে যার পর নাই ভাল বাসেন। সহস্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও মুহুর্মুহুঃ তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করেন। বস্তুতঃ অপরাপর লোক অপেক্ষা রাধানাথ বাবুর হৃদয় সমধিক স্নেহপ্রবণ সন্দেহ নাই।

পূজার শুভদিন সমাগত হইল। আনন্দ-কোলাহলে—বাদ্যশব্দে বাটী আনন্দময়! যথানিয়মে এক একদিন করিয়া তিন দিনে তিন পূজা সমাপ্ত হইল। পরদিন বিজয়া-দশমীতে জগন্ময়ী জগদম্বাকে একবৎসরের জন্য অগাধ সলিলে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল। সেদিনও একরূপ গোলমালে কাটিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজে একমাস অবকাশ পাইয়াছেন। তন্মধ্যে দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ অতীত হইল। একদিন সুরেন্দ্রনাথ আপনার গৃহে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে সরোজিনী তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, "দাদা! আমি পড়্‌বো।"

সুরেন্দ্রনাথ ভগ্নীটীকে যার পর নাই ভাল বাসিতেন। তাহার আবদার দেখিয়া কহিলেন, "দিদিমণি! তুমি পড়্‌বে?" সরোজিনী অমনি বলিয়া উঠিল, "দাদা! আমি পড়্‌বো, লিখ্‌বো, দুই কোর্‌বো।" তখন সুরেন্দ্রনাথ ভূমিতলে ক খ লিখিয়া দিলে সরোজিনী খড়ি দ্বারা সেই লেখার উপর দাগা বুলাইতে আরম্ভ করিল।

একদিন রাধানাথ বাবু কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, সরোজ কোথায়? তাহাকে যে দেখতে পাচ্চি নে? মা আমার বুঝি কোথায় খেলা কোরে বেড়াচ্চে?"

রাধানাথ বাবু যেমন এই কটী কথা মুখ হইতে নির্গত করিয়াছেন, অমনি সরোজিনী দৌড়াইয়া আসিয়া পিতার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক কহিল, "এই যে বাবা আমি! আমি দাদার কাছে ছিলেম।"

রাধানাথ বাবু কন্যাটীকে ক্রোড়ে লইয়া আদর সহকারে মুখচুম্বন পূর্ব্বক কহিলেন, "এ কি মা!—তুমি আমার লক্ষ্মী মা! তোমার হাতে—মুখে এত ধুলো কেন মা?"

সরোজিনী আদরের স্বরে কহিল, "বাবা! আমি দাদার কাছে লিখ্‌ছিলেম। দাদা আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন।"

এই কথা শুনিয়া রাধানাথ বাবু কহিলেন, "সে কি মা! তোমার আবার লেখাপড়া কেন? তোমার লেখা পড়ায় দরকার কি?"

পিতার এই সমস্ত কথা পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে সুরেন্দ্রনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পিতার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "তাতে দোষ কি বাবা? আজি কালি কলিকাতায় সকল মেয়েতেই লেখা পড়া শিখ্‌ছে। তাদের শিক্ষা দিবার জন্য কত ভাল ভাল স্কুল রয়েছে।"

সুরেন্দ্রনাথের মতের বিরুদ্ধে রাধানাথ বাবু কোন কাজই করিতেন না। তিনি পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা বাবা! তোমার যা ইচ্ছা, কর, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এই কথা বলি যে, তুমি কদিনই বা বাড়ীতে থাক্‌বে?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখুন, এই চারি দিনের মধ্যে সরোজের ক খ শেষ হয়েছে। আমি যে কয়েকদিন এখনও

বাড়ীতে থাক্‌বো, বোধ হয়, তার ভিতর অনেক শিখ্‌তে পার্‌বে।"

এই কথা শুনিয়া রাধানাথের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি কন্যার মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "বটে! মা আমার তবে সরস্বতী হয়েছে। মা! তুমি আমার লক্ষ্মী, না, সরস্বতী?

সরোজিনী পিতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া হাসিতে লাগিল। তখন রাধানাথ বাবু তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া কহিলেন, "আচ্ছা মা! এখন যাও, তোমার দাদার কাছে গিয়ে পড়া শিখ!"

রাধানাথ বাবু কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলে সরোজিনী সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার গৃহে গিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ যতদিন বাটীতে থাকিলেন, বিশেষ যত্নের সহিত সহোদরাকে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে প্রায় একমাস অতীত হইল। একমাসের মধ্যে সরোজিনী বানান, ফলা সমস্ত শিক্ষা করিল। তাহার মেধা ও বুদ্ধিশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে, লেখাপড়া শিক্ষা করিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্টই বোধ হইত না। ক্রমে ছুটীর দিন শেষ হইয়া আসিলে সুরেন্দ্রনাথ ভগ্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ ভগ্নি! আমি কলিকাতায় গিয়ে তোমার জন্য একখানি বই পাঠিয়ে দিব। যদি সেইখানি পড়া শেষ কোরে আমাকে চিঠী লিখ্‌তে পার, তা হোলে আমি আবার যখন বাড়ীতে আস্‌বো, তখন তোমার জন্ত দিব্য একটী ফুল আন্‌বো।"
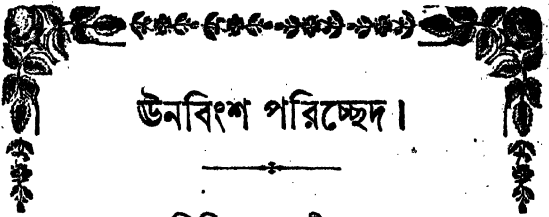
"সে কি দাদা?"—আগ্রহ সহকারে সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি দাদা? সে কি রকম?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে একরকম ফুল, দেখ্‌তে বেশ চমৎকার। তুমি খোঁপায় পোর্‌বে।"

হাসিতে হাসিতে সরোজিনী বলিল, "দাদা! তুমি ভুলে যাবে। তোমার মনে থাক্‌বে না।—আন্‌বে ত?—ভুল্‌বে না ত?"

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন, "না।" এইরূপ নানা কথোপকথনের পর উভয়ে আহারাদি করিতে প্রস্থান করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিবিড় বনে নীরদ।

পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিতে পারে, মোহনগড় গ্রামের নদীতীরে বটবৃক্ষমূলে দিনকয়েকের জন্য এক পরমহংস আসিয়াছিলেন। হীরার মা তাহার বৌদিদিকে লইয়া পুত্র-কামনায় সেই পরমহংসের নিকট গিয়াছিল। তিনি লোকের দৌরাত্ম্যে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু কোথায় গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারে না। কিরূপে বলিবে? বিশেষ কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার অনুসন্ধান করিবে? যাহার সহিত জগতে কোন সম্বন্ধ নাই, কে তাহার অনুসন্ধান লইয়া থাকে? সেই পরমহংস মোহনগড় পরিত্যাগ করিয়া সাগর-সঙ্গমের অনতিদূরে নিবিড় বনমধ্যে আশ্রম সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন।

একদা যোগীবর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাধানের জন্য বনপ্রান্তস্থ নদীতীরে সমাগত হইয়াছেন, অকস্মাৎ একটী মৃতকল্প যুবা তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল;—দেখিলেন, নদীতীরস্থ একটী বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন হইয়া যুবামূর্ত্তি কর্দ্দমোপরি শয়ান রহিয়াছে।

দর্শনমাত্রই বোধ হইল, জোয়ারের সময় ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া, এই বৃক্ষডালে আবদ্ধ হইয়াছে। এখন ভাঁটা, সুতরাং জলাপগমে কর্দ্দমোপরি নিপতিত রহিয়াছে।

যাঁহারা কামাদি ষড়রিপুকে পরাভব করিয়া মনকে নিগৃহীত করতঃ অখিল বাসনাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, ঈশ্বরই যাঁহাদিগের একমাত্র ধ্যান—জ্ঞান, তাঁহারাই প্রকৃত সাধু। তাঁহাদিগের হৃদয় যে স্বতঃসিদ্ধ দয়া-স্নেহে পরিপূর্ণ, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। মৃতকল্প যুবাকে দেখিবামাত্র পরমহংসের হৃদয় দয়া-স্নেহে অভিষিক্ত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, অচেতন বটে; কিন্তু এখনও জীবন বহির্গত হয় নাই। মৃদু মৃদু শ্বাসবায়ু নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত হইতেছে। যোগীবর অবিলম্বে যুবাকে ধীরে ধীরে স্কন্ধোপরি উত্তোলন করিয়া আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তিনি আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অগ্নিসেকাদি নানারূপ শুশ্রূষা দ্বারা যুবাকে সচেতন করিলেন। এতক্ষণের পর যুবামূর্ত্তির নেত্র উন্মীলন হইল, কিন্তু কথা কহিবার শক্তি নাই। যোগীবর একপ্রকার বৃক্ষপত্রের রস বাহির করিয়া যুবাকে সেবন করাইবামাত্র তাঁহার দেহ সতেজ হইয়া উঠিল। তখন পরমহংস মহোদয় তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তোমাকে দর্শনমাত্র আমার হৃদয়ে স্নেহ-সঞ্চার হইয়াছে। যদি তুমি সুস্থ হইয়া থাক, বাক্য-প্রয়োগে যদি যন্ত্রণা বোধ না হয়, আত্ম-পরিচয় দিয়া আমার কৌতূহল পূর্ণ কর।"

যোগীর বাক্য শ্রবণমাত্র যুবার নয়নদ্বয় হইতে দর দর ধারে অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল, তাঁহার

কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি একটীমাত্রও বাক্য স্ফুরণে সমর্থ না হইয়া চিত্র-পুত্তলিকাবৎ মৌনভাবে অবস্থিত রহিলেন।

পাঠক-মহাশয়েরাও বোধ হয় যুবার পরিচয় জানিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছেন। সুতরাং আপনাদিগকে উৎকণ্ঠিত রাখা সমুচিত নহে। এই যুবা অপর কেহই নহেন, ইনিই অভাগিনী বসন্ত-লতার জীবিতেশ্বর নীরদ চরণ।

যিনি এই চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, যাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্য দিবানিশি স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, যিনি অহরহঃ আহার প্রদান দ্বারা ভূতগ্রামের রক্ষা-বিধান করিতেছেন, তাঁহারই কৃপায় নীরদ বাবুর অমূল্য জীবন পরিরক্ষিত হইয়াছে। যখন তিনি নদীগর্ভে নিপতিত হন, তখন প্রথমতঃ গভীর জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিলেন সত্য; প্রবল স্রোতোবেগ তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে অনেক দূরবর্ত্তী করিয়া দিল বটে, কিন্তু সন্তরণপটু বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সলিলোপরি ভাসমান হইয়া উঠিলেন। ইচ্ছা ছিল তীরে উঠিবেন, কিন্তু একে অন্ধকার নিশা, তাহাতে প্রবল স্রোতোবেগ, সে আশা বিফল হইল। তিনি ভাসিতে ভাসিতে প্রায় দুই তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন। ক্রমে শরীর অবসন্ন হইল, হস্তপদ নিস্তেজ হইয়া উঠিল, আর সন্তরণ দিতে সক্ষম হইলেন না। নিরুপায় হইয়া আসন্ন মৃত্যু বিবেচনায় একান্তঃকরণে মধুসূদনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ একখানি কাষ্ঠফলক তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হইল। তিনি সেইখানি অবলম্বন পূর্ব্বক ভাসিতে ভাসিতে

দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। অনতিকালমধ্যেই তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল। ভাসিতে ভাসিতে সাগরসঙ্গমের অনতিদূরে একটী বৃক্ষশাখায় গিয়া সংলগ্ন হইলেন। তৎকালে ভাটা বশতঃ সহসা জলের বেগ হ্রাস হওয়াতে সেই শাখাতেই সংলগ্ন ছিলেন,—প্রাতঃকালে পরমহংসের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। করুণাময়ের প্রসাদে নীরদের জীবন পরিরক্ষিত হইল। যদি সেই দয়াময় করুণকটাক্ষে দৃষ্টিপাত না করিতেন, তাহা হইলে হয় ত নীরদ ভাসিয়া ভাসিয়া অনন্ত সাগরমধ্যে পতিত হইতেন, অনন্ত সাগরেই তাঁহার জীবনান্ত হইয়া যাইত সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের কৃপাবশেই বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন হইয়াছিলেন, ঈশ্বরের কৃপাতেই পরমহংস তাঁহাকে নয়নগোচর করেন।

নীরদ অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া—পতিরতা বনিতাসুখে সুখী হইয়া কোনরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। বিধাতা সে সুখেও বঞ্চিত করিলেন। বসন্ত-লতার মুখপদ্ম—বসন্তের সেই মধুর হাস্য—বসন্তলতার প্রেম তাঁহার চিত্তপটে জাগরূক হইতে লাগিল। তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দর্শন করিতে লাগিলেন। স্বভাবতঃ দূরদেশে যাইতে হইলে, সহজেই স্ত্রী-পুত্রের মায়া পরিত্যাগ করা যায় না, চক্ষু ফাটিয়া জল বহির্গত হয়, কিন্তু সে স্থলে পুনরায় সমাগমের আশা থাকে। নীরদের হৃদয়ে আজি সে আশাও নাই। বসন্ত-লতা পূর্ণগর্ভা, তাহার উপর সাংঘাতিক পীড়া। তদবস্থায় যে তিনি জীবিতা আছেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া নীরদের প্রাণ একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তিনি প্রথমতঃ যোগীবরের প্রশ্নে কিছুই

উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে যাবদীয় ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন।

পরমহংস নীরদের মুখে তদীয় জীবন-বৃত্তান্ত শ্রুতি-গোচর করতঃ ক্ষণকাল নেত্রযুগল মুদিত করিয়া রহিলেন। অনন্তর একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আমি তোমাকে সুতনির্ব্বিশেষে স্নেহ করি। আমার বাক্যে অবহেলা বা অবিশ্বাস করিও না। তুমি হৃদয় হইতে চিন্তা বিসর্জ্জন কর। তোমার কোন ভয় নাই। যিনি তোমার এই অমূল্য জীবন রক্ষা করিয়াছেন, সেই পরমপিতা বিশ্বনিয়ন্তার কৃপায় তোমার প্রিয়তমা সাধ্বী বসন্ত-লতাও প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে সন্দেহ নাই।"

এই কথা শুনিবামাত্র নীরদের প্রাণ আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে যোগীর পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! আপনি অন্তর্যামী, আপনার অগোচর বা অসাধ্য কিছুই নাই। যাহাতে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, যাহাতে আমি সেই দুঃখিনীর মুখপদ্ম দেখিতে পাই, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দাসকে চরিতার্থ করুন।"

যোগীবর কহিলেন, "বৎস! উতলা হইও না। আমি পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, আমার কথায় অবহেলা বা অবিশ্বাস করিও না। আমার বাক্যের বিপরীতাচরণ করিলে আশা ফলবতী হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিলক্ষণ বিপদের আশঙ্কা। তুমি কিছুদিন এইস্থানে আমার নিকট অবস্থান কর। যখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবে, আমি

স্বয়ং তোমাকে তখন তোমার সহধর্ম্মিণীর নিকট পাঠাইয়া দিব।”

নীরদ যোগীর প্রতিকূলে আর কোন কথা উত্থাপন করিতে সাহসী হইলেন না। অগত্যা সেই নিবিড় বনে পরমহংসের আশ্রমে নবীন-সন্ন্যাসীরূপে তাঁহাকে অবস্থিতি করিতে হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নববন্ধু লাভ।

সুরেন্দ্রনাথ শারদীয়া পূজার পর পুনরায় যথানিয়মে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। একদিন তিনি তিনটার পর স্কুল হইতে বাটীতে প্রত্যাগমনের সময় পথিমধ্যে হেদুয়া দীঘীর চতুর্দ্দিকে নবীন তৃণোপরি পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অকস্মাৎ একটী বালক পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া অলক্ষিতে দুই হস্তে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আবরণ করিয়া ধরিল।

বাল্যাবস্থার বাল্যলীলা—বাল্যপ্রেম অতীব মধুর! সুরেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, "ভাই সতীশ! আমি বুঝিতে পারিয়াছি, আর কেন ভাই? ছাড়িয়া দেও!"

সতীশ অমনি হাসিতে হাসিতে হাত ছাড়িয়া দিলেন। সতীশ সুরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু। সুরেন্দ্রনাথ অতি সুবোধ, সকলের সহিতই তাঁহার প্রণয়, তাঁহার স্বভাব অতীব প্রশান্ত। অপরাপর বালকের ন্যায় হইলে চক্ষু আবরণ করিবামাত্র হয় ত কতই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি সেরূপ নহে। সতীশ হস্তাবরণ অপসারিত

করিলে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার হাত ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে নানারূপ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। সতীশ বলিলেন, "ভাই! আমি তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম, তোমাকে দেখিতে না পাইয়া অন্বেষণার্থ এইদিকে আসিয়াছি।"

কোন কোন দিন হঠাৎ মনের চাঞ্চল্য জন্মিলে, সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের ছুটীর পর বাটীতে না গিয়া হেদুয়ার চারিধারে ভ্রমণ করিতেন। সতীশের সে বিষয় জানা ছিল, সেই বিবেচনাতেই এইস্থানে অন্বেষণ করিতে আসিয়াছেন। অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রান্তিবোধ হওয়াতে উভয়ে একখানি পাষাণের উপর বসিয়া পড়িলেন। অমনি সতীশের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল, "প্লীজী ওয়েদার।"

"ইয়েস্ মাইডিয়ার" বলিয়া সুরেন্দ্রনাথও নানাপ্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে টং টং করিয়া, ঘড়ীতে চারিটা ঘোষণা করিল। অমনি জেনারল্ এসেম্ব্লী ইন্‌ষ্টিটিউসন নামক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ গোলমাল করিতে করিতে রাজমার্গে বহির্গত হইতে লাগিল। সুরেন্দ্র বাবু অমনি চমকিত হইয়া উঠিলেন। আর অধিক বিলম্ব হইলে ভৃত্য অনুসন্ধানার্থ আসিতে পারে, এই বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই, আর বিলম্বে কাজ নাই। চল, গৃহে যাওয়া যাউক।"

উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। কতিপয় পদমাত্র অগ্রসর হইয়াই সতীশ বলিলেন, "ভাই, আমি প্রত্যহই তোমাদের বাটীতে যাই, অদ্য চল, তুমি আমাদের বাটীতে যাইবে।"

ফাল্গুন মাস। আকাশ নির্ম্মল। ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া, পথিকের আনন্দ জন্মাইয়া দিতেছিল। অকস্মাৎ বায়ু প্রবল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে এরূপ বেগে বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, পথের ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল সমাবৃত করিল। যেন চারিদিক অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। কাহারও চক্ষু মধ্যে ধূলিকণা প্রবিষ্ট হওয়াতে আর নেত্র উন্মীলনে সমর্থ হইল না। কেহ কেহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উত্তরীয়-বসনে মস্তক ও চক্ষু ঢাকিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কেহ কেহ ছত্রদ্বারা বায়ুর প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ধূলিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। চারিদিকে অসংখ্য গাড়ীর ভিড়। গাড়োয়ানেরা সত্বর গমনে অভিলাষী হইয়া বায়ুবেগে অশ্বচালনা করিতেছে। বাতাসের শন্ শন্ শব্দে পথিকগণ সকলেই আকুলিত। একটী বালক পথের একধার হইতে অন্যধারে যাইতেছিল, অকস্মাৎ একখানি গাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে গাড়োয়ান তাহাকে চাবুকের আঘাত করিল। বালকটী অমনি দুই একপদ অগ্রসর হইতে না হইতেই ভূতলে পতিত হইল। গাড়ী তৎপার্শ্ব দিয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিল। সরলহৃদয় সুরেন্দ্রনাথ সেই বালককে পতিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত সমস্তভাবে উত্থাপিত করিলেন। তখন বালকটী রোদন করিতেছিল। তাহার অঙ্গ ধূলায় ধূসর। সুরেন্দ্রনাথ তাহার গাত্রের ধূলি মুছাইয়া প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক হাত ধরিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিবামাত্র বায়ুর প্রবলতারও হ্রাস হইল, পুনর্ব্বার গগনমণ্ডল পূর্ব্ববৎ নির্ম্মলতা ধারণ করিল। তখন সুরেন্দ্রনাথ

সেই বালকটীকে মধুর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ভাই?"

"শ্রীনলিনীমোহন দেবশর্ম্মা"—বালকটী তৎক্ষণাৎ ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আমার নাম শ্রীনলিনীমোহন দেব-শর্ম্মা।"

বলিতে বলিতেই সকলে সুরেন্দ্রনাথের বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ যত্নসহকারে অনুরোধ করিয়া নলিনীকে আপনার বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। সতীশও সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ নলিনীকে কিঞ্চিৎ আহারীয় প্রদান করিলে বালক প্রথমতঃ তাহা গ্রহণে অসম্মত হইল, পরে সুরেন্দ্রের সরলতায় ও অনুরোধে বাধ্য হইয়া ভক্ষণ করিল। তখন সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায় ভাই?"

"আমার প্রকৃত বাড়ী কোথায়, অদ্যাপি তাহা আমি পরিজ্ঞাত নহি। তবে এখন এই কলিকাতার মালাপাড়ায় থাকি।"

সুরেন্দ্রনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালাপাড়ায় তোমার বাসাবাটী? তোমার পিতার নাম? পিতার নাম বলিলে, আমি বোধ হয় চিনিতে পারিব। কারণ, মালা-পাড়া আমাদের বাড়ী হইতে ত অধিকদূর নহে।"

প্রশ্ন শুনিয়া নলিনীমোহনের চক্ষু হইতে দর দর-ধারে অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। তাহার অন্তরে বিষম নির্ব্বেদ সঞ্চার হইল। অবশেষে ধৈর্য্যসহকারে চিত্তবেগ সংযত করিয়া কহিল, "আমি পিতার নাম জানি না। এতদিন আমাকে কেহ এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করে নাই। তবে আমি এইমাত্র শুনিয়াছি যে, আমি ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই আমার পিতা নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। এখন তিনি জীবিত আছেন কি না, তাহাই বা কিরূপে জানিব ?”

দুঃখের কথা শুনিয়া সরলহৃদয় সুরেন্দ্রের প্রাণে আঘাত লাগিল। তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, তুমি কাহার যত্নে প্রতিপালিত হইতেছ ? কে তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন ?”

“আমার জননীই আমার সংসারের একমাত্র অবলম্বন। আমার দুঃখে দুঃখী হয়, আমার ব্যথায় ব্যথা পায়, সেরূপ লোক জগতে আর তাঁহার ন্যায় কেহই নাই।”

“বাটীতে কি তবে কেবল তোমার মাতা একাকিনীই থাকেন ?”

“না, হীরার মা নামে একটী স্ত্রীলোক আছে। সে আমাকে পুত্রাপেক্ষাও যত্ন করে। আমার এইরূপ বিলম্ব দেখিয়া হয় ত সে কতই ব্যস্ত হইতেছে। আপনি একটী লোক দ্বারা আমাকে বাটীতে পৌঁছাইয়া দিলে, পরম উপকৃত হই।”

মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, “তোমার কোন ভয় নাই, আমি নিজে তোমাকে তোমার জননীর নিকট রাখিয়া আসিব। এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমার কি আর ভাই কিম্বা ভগ্নী নাই ?”

“না,—আমার সহোদর বা সহোদরা নাই। আমিই দুঃখিনী জননীর একমাত্র সন্তান।” বালক সকল কথারই উত্তর দিল, কিন্তু নরেন্দ্র বাবু যে তাহার মেসো, সে

কথা আদৌ উত্থাপন করিল না। বালকের বুদ্ধি, কেন যে সে কথা বলিল না, তাহা সেই-ই বলিতে পারে।

পুনরায় সুরেন্দ্রনাথ মধুর সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ভাই! তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমাকে যে গাড়োয়ান কশাঘাত করিয়াছে, তোমার জননীর নিকট এ কথা কি প্রকাশ করিবে?"

"না।"

উত্তর শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বলিবে না?"

"শুনিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইবেন। যাহাতে জননীর প্রাণে আঘাত লাগে, তাহা আমি ইচ্ছা করি না।"

বালকের সুবুদ্ধি ও সরলতা দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ যার পর নাই প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, যদি তোমার জননী আজি এত বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, কি উত্তর দিবে?"

"বলিব, ঝড়ের জন্য আসিতে পারি নাই।"

"তবে আমাদের কথা বলিবে না?"

"বলিব।"

"কি বলিবে?"

"এই কথা বলিব যে, ঝড়ের সময় দুইটী বালকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা যদিও আমা অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়, তথাপি তাঁহাদিগের স্বভাব দর্শনে পরম বন্ধুর ন্যায় জ্ঞান হয়। ঝড়ের সময় তাঁহাদের বাটীতেই ছিলাম।"

"তোমার জননী যদি বলেন, কেন তাহাদের বাটী গিয়াছিলে?"

"আমি বলিব, তাঁহারা আদর করিয়া—স্নেহ করিয়া ডাকিলেন, সেই জন্যই গিয়াছিলাম।"

"বালকের সরলতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন, বেশ ভাই! আজি হইতে তুমি আমার নববন্ধু হইলে; তোমাকে পাইয়া আজি আমি প্রকৃত বন্ধুমান্ হইলাম।"

কথোপকথন করিতে করিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। কলিকাতা মহানগরী আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া রূপবতী কামিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন সুরেন্দ্রনাথ ভৃত্যকে একটী লণ্ঠনের আলো আনিতে অনুমতি করিলে, সে তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালন করিল। সুরেন্দ্রনাথ নলিনীকে তাহার বাটীতে রাখিয়া আসিবার জন্য গমনোদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে নলিনী কহিল, "আপনাকে আর কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে না, আপনার ভৃত্য সঙ্গে থাকিলেই যথেষ্ট উপকার হইবে। আপনার এরূপ পরিশ্রমে আবশ্যক কি?"

সুরেন্দ্রনাথ সহাস্যবদনে কহিলেন, "দেখ ভাই! আজি হইতে তুমি আমার বন্ধু হইলে, তোমার বাটীতে যাইব, ইহাতে আর কষ্ট কি? আর একটী কথা বলি, তুমি বন্ধু—সহোদর তুল্য, আমাকে 'আপনি' সম্বোধন না করিয়া 'তুমি' সম্বোধন করিলেই সুখী হইব। তোমাকে আরও একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।"

কিঞ্চিৎ চমকিত হইয়া নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি প্রতিজ্ঞা?"

"তুমি প্রত্যহ আমাদের বাড়ী আসিবে।"

"আসিব।"

"ভুলিবে না?"

"আজি যে উপকার পাইয়াছি, তাহাতে আজীবন ভুলিতে পারিব না।"

হাস্য করিয়া—সরলতা জানাইয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ভাই! আমি এরূপ কি উপকার করিয়াছি যে, চিরজীবন আমার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে? যাহা হউক, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন্ স্কুলে পড়?"

"আমি কলেজে স্কুল ডিপার্টমেণ্টে চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি।"

শুনিয়া সুরেন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সহাস্যবদনে কহিলেন, "তবে আরও উত্তম। তুমি প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যাইবার সময় আমার নিকট আসিবে, একত্রে দুইজনে যাইব। কেমন, ভুলিবে না ত?"

"না, ভুলিব কেন?"

এইরূপ কথোপকথনের পর সুরেন্দ্রনাথ সতীশকে বিদায় দিয়া ভৃত্যসহ নলিনীকে লইয়া মালাপাড়ার দিকে অগ্রসর হইলেন।

এদিকে নলিনীর এত বিলম্ব দেখিয়া হীরার মা একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকমহাশয়েরাও এখন বিলক্ষণ-রূপে নলিনীকে চিনিতে পারিয়াছেন। এই নলিনীই অভাগিনী বসন্ত-লতার একমাত্র অঙ্করত্ন। নীরদ বাবুর নিরুদ্দেশের কতিপয় দিনমাত্র পরেই নলিনী ভূমিষ্ঠ হয়। এখন নলিনী শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া নরেন্দ্রবাবুর সাহায্যে বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে নলিনী সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনাদের দ্বারদেশে উপনীত হইল। তাহাকে দেখিয়া হীরার মা আনন্দে অধীরা হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। সুরেন্দ্রনাথ নলিনীর সহিত মধুর সম্ভাষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভৃত্য-সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।
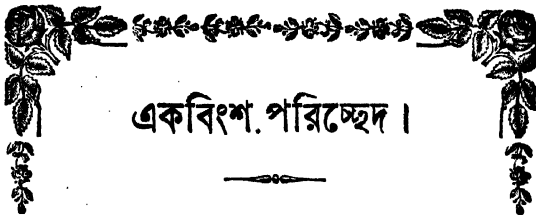
একবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহামহা বারুণী।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া ত্রয়োদশী,—বারুণী তিথি। তাহাতে আবার এ বৎসর অত্যন্ত যোগ। শনিবার, শত-ভিষানক্ষত্র, সুতরাং মহামহা বারুণী হইয়াছে। চারি-দিক্ হইতে নর-নারী ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে ছুটিতেছে, কাহাকেও আর পশ্চিমগামী দেখা যায় না।

পল্লীগ্রামে কুলবধূরা কক্ষে কুম্ভ লইয়া জল আনয়নার্থ দূর-দূরস্থ জলাশয়ে গমন করিয়া থাকে। তাহাতে কোনরূপ নিন্দা বা অপমান নাই। দেশের প্রথা অনু-সারে কতকগুলি স্ত্রীলোক পথিমধ্যে একত্রিত হইয়া নানা-রূপ কথোপকথন করিতেছে। কেহ বলিতেছে, "আমরা ভাই পরশ্ব তারিখে বারুণীস্নান কোত্তে যাব। এবার না কি বড় যোগ। এরকম যোগ না কি সচরাচর দেখা যায় না? আমাদের বাড়ীর সকলেরই যাওয়া মত হয়েছে।" কোন নারী বলিতেছে, ভাই, তোমরা যা মনে কর, তাই কোত্তে পার। আমার পোড়াকপালে এম্নি আনাড়ীর হাতে পোড়েছি যে, এক পা কোথাও যেতে দেয় না। সেবার বাবা নিতে এলেন, তা দুদিনের

জন্যে পাঠালে না। এমন বেহায়া মানুষ ভাই কখন দেখি নি।”

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, অকস্মাৎ রাধানাথ বাবুর গৃহিণী সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিসের কথাবার্ত্তা হইতেছে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোরা কিসের গোলমাল কচ্চিস্?”

জনৈক স্ত্রীলোক অমনি বলিয়া উঠিল, “ভাই, এবার বড় যোগ হয়েছে,—মহামহা বারুণী। দেশদেশান্তরের লোক পিঁপ্‌ড়ের মত সব ছুটেছে। তাই বলি, আমাদেরও গেলে হয় না?”

বারুণীর কথা শুনিয়া রাধানাথ বাবুর পরিবারের মন বিচলিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কল্পনা করিলেন যে, এই সূত্রে কলিকাতায় গেলে একবার সুরেন্দ্রনাথকেও দেখিয়া আসা যায়। মনে মনে এই চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তখন রাধানাথ বাবু কার্য্যান্তরে কোথায় গমন করিয়াছেন। তাঁহার গৃহিণীর মন বার পর নাই চঞ্চল হইয়া উঠিল। কখন্ পতি গৃহে আসিবেন, কখন্ তাঁহার নিকট মনের বাসনা খুলিয়া বলিবেন, কিরূপে তাঁহাকে সম্মত করাইবেন, এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়কে ব্যাকুলিত করিতে থাকিল।

অনতিবিলম্বেই রাধানাথবাবু গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার হস্তে একখানি পত্র। তদ্দর্শনে তাঁহার পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি কলিকাতার পত্র?”

রাধানাথবাবু কহিলেন, “না, এখানি জমিদারী হইতে আসিয়াছে। সেখানে বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত, আমাকে যাইতে হইবে।”

রাধানাথবাবুর গৃহিণী কিঞ্চিৎ অভিমানস্বরে কহিলেন, "জমিদারী জমিদারী কোরেই তুমি পাগল হলে। বাছা আমার কলিকাতায় রয়েছে, তার খবর পাই নি, কেমন আছে জানি নি, সে খোঁজ নেও না।"

বিস্মিত হইয়া রাধানাথবাবু বলিয়া উঠিলেন, "সে কি? এই ত সেদিন পত্র পেয়েছি, ভাল আছে, বেশ লেখাপড়া হচ্চে।"

গৃহিণী কহিলেন, "কে জানে আমার মন বড়ই চঞ্চল হয়েছে। বিশেষ আজি রাত্রে একটা কুস্বপ্ন দেখেছি, তাতে আমার প্রাণ কিছুতেই স্থির হচ্চে না। চল, একবার কলিকাতার বাড়ীতে যাই।"

"এখন কলিকাতায় কোনমতেই যেতে পারবো না। জমিদারীতে না গেলেই নয়।"

এই কথা শুনিয়া গৃহিণী কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন, "আমার বাছা বেঁচে থাকলে ত জমিদারী? নৈলে জমিদারী নিয়ে কি কোরবো? মা সুবচনি! মা! আমি যেন কালি কলিকাতায় গিয়ে বাছাকে সুস্থ দেখতে পাই, আমার বাছাকে ভাল রাখ মা! তোমার পূজা দিব।"

অদূরে সরোজিনী খেলা করিতেছিল। সে কলিকাতার নাম শুনিবামাত্র অমনি দৌড়াইয়া আসিল। এখন তাহার বয়ঃক্রম আট বৎসর। এখন সে বেশ লেখা পড়া শিখিতেছে, দুই তিনখানি পুস্তক শেষ করিয়াছে। হাতের অক্ষরগুলিও যেন মুক্তার ন্যায় মনোহর। ফল কথা, এই বয়সে যত দূর লেখাপড়া শিক্ষার ও বুদ্ধির সম্ভব, সরোজিনীর তৎসমস্তই অধিকার হইয়াছে। সে দ্রুতপদে আসিয়া পিতার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক কহিল, বাবা! আমি

কলিকাতায় যাব!—দাদাকে দেখ্‌বো, দাদাকে অনেক দিন দেখি নি।”

রাধানাথবাবু মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, “না মা! এখন কলিকাতায় যাওয়া হবে না। আমার সময় নাই, কার সঙ্গে যাবে?”

সরোজিনী কাঁদিতে লাগিল, আর প্রবোধ মানে না। সে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার গলদেশ ধরিয়া পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল, “তোমার সঙ্গে যাব। আমায় নিয়ে যেতে হবে, নৈলে আমি কিছু খাব না।”

সাধারণতঃ পুত্রাপেক্ষা কন্যার প্রতিই পিতার অধিক স্নেহ জন্মিয়া থাকে। সরোজিনীর রোদন রাধানাথবাবুর প্রাণে আর সহ্য হইল না। এই ইতিপূর্ব্বে যিনি জমিদারীতে যাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, জমিদারী নষ্ট হইবার আশঙ্কায় কোনরূপেই পত্নীর বাক্যে সম্মতিদান করেন নাই, পরক্ষণেই কন্যার স্নেহে পড়িয়া তাঁহাকে সেই প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিচ্যুত হইতে হইল। আগামী প্রভাতেই রাধানাথ বাবু কলিকাতা গমনে কৃতসংকল্প হইলেন।

রাধানাথবাবুর সম্মতিদর্শনে গৃহিণীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি সমস্ত আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন! মূল্যবান্ দ্রব্যাদি প্রতিবাসী কোন ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখিয়া, সমস্ত গৃহেরই দ্বার রুদ্ধ করা হইল। কেবল ভৃত্যগণের আবশ্যকীয় গৃহ উন্মুক্ত থাকিবে। এইরূপে সমস্ত স্থিরীকৃত হইলে পরদিন প্রভাতে শিবিকারোহণে রাধানাথ বাবু কন্যা-কলত্র সমভিব্যাহারে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।
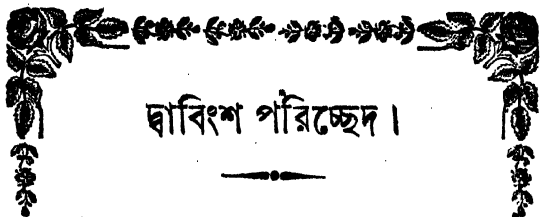
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

গুডফ্রাইডে।

বারুণীর যোগেই গুডফ্রাইডে পড়িয়াছে। সমস্ত আপিস ও বিদ্যালয় বন্ধ। সুরেন্দ্রনাথ কতিপয় বন্ধু-বান্ধবের সহিত কলিকাতার বাটীতে বসিয়া বিদ্যাবিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। হঠাৎ সতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই সুরেন্দ্র! সে দিন যে বালকটী রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছিল, যাহাকে সঙ্গে করিয়া তুমি বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছিলে, তাহার কোন পরিচয় পাইয়াছ?"

একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "সে বড়ই দুঃখের কথা! আমি তার পর দিবসেই তাহার জননীর নিকট গিয়া সমস্ত শুনিয়াছি। বালকটীর এক মেসো আছেন, তিনি অতি সম্ভ্রান্ত লোক, তিনিই এখন ভরণপোষণ ও স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন।"

আগ্রহের সহিত সতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে বালকটীর মেসো?—তাঁহার বাড়ীই বা কোথায়?"

"তাঁহার নাম নরেন্দ্র নাথ বাবু,—ডাক্তারী করেন, আমাদের এই পাড়াতেই চিকিৎসা করেন।"

সতীশচন্দ্র কহিলেন, "ঠিক কথা, তিনি একজন মহৎ লোক বটে।"

এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তিনিই এখন নলিনীর একমাত্র সহায়।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইত্যবসরে নলিনীও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ আদর করিয়া তাহাকে আপনার পার্শ্বে বসাইলেন। এখন সুরেন্দ্রনাথের সহিত নলিনীর পরম বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। উভয়েই সর্ব্বদা উভয়ের বাটীতে যাতায়াত করেন। নলিনীর জননী সুরেন্দ্রকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন, সুরেন্দ্রও তাঁহাকে জননীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন। এখন আর নলিনীকে পড়ার জন্য প্রয়াস পাইতে হয় না, আর গৃহশিক্ষকেরও আবশ্যক নাই। সুরেন্দ্রনাথই তাহাকে সমস্ত শিক্ষা প্রদান করেন। ফল কথা, নলিনী ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়ে এখন একাত্মা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সুরেন্দ্রনাথ সকলের সহিত কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী আসিয়া সদর দরজায় দণ্ডায়মান হইল। সকলেই চমকিত হইয়া বহির্গত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, গাড়ীর কোচবাক্সে তাঁহাদিগের পুরাতন ভৃত্য রামদয়াল বসিয়া রহিয়াছে। তখনই বুঝিতে পারিলেন যে, জনক জননী ও ভগিনী সরোজিনী আসিয়াছেন সন্দেহ নাই।

দেখিতে দেখিতে রাধানাথ বাবু ও তাঁহার গৃহিণী গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। সরোজিনী লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতপদে সুরেন্দ্রনাথের নিকট

উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। সুরেন্দ্রনাথের জনক-জননী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে সেদিনের মত বন্ধুবান্ধবেরা সুরেন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। আনন্দে আনন্দে সে দিন অতিবাহিত হইল।

পরদিন সুরেন্দ্রনাথ নিজ গৃহে বসিয়া অধ্যয়ন করিতে-ছেন, এমত সময়ে সরোজিনী তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, "দাদা! আমি অনেক পড়া শিখেছি।"

ভগিনীর মধুমাখা কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ তাহার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, সরোজিনী তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ সরোজ! তোমাকে যে বই পোড়্‌তে দিয়েছিলেম, তা শেষ করেছ?"

"হ্যা দাদা! আমি তা অনেক দিন শেষ করেছি।"

"আচ্ছা, তোমাকে যদি কিছু জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দিতে পার্‌বে?"

"কেন পার্‌বো না?"

"আচ্ছা বল দেখি, ইন্দ্রিয় কয় প্রকার?"

"দাদা! ও আমি খুব জানি। ইন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার।"

"কি কি বল দেখি?"

"চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্।"

"আচ্ছা, তুমি লিখ্‌তে শিখেছ?"

"হ্যাঁ, আমি খুব লিখ্‌তে পারি।"

"কৈ, লিখ দেখি?"

"কি লিখ্‌বো?"

মনে কর যেন বাড়ীতে আছ, আর আমি কলিকাতায় আছি। এমন সময় তোমার কোন জিনিসের দরকার হলো, তা আমাকে কি বোলে পত্র লিখ্‌বে, তাই লিখ।”

সুরেন্দ্রের সম্মুখেই টেবিলের উপর কাগজ কলম দোয়াত সমস্তই ছিল। সরোজিনী তাড়াতাড়ি কাগজ কলম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিল:—

পরমপূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রজ মহাশয়

শ্রীচরণ-কমলেষু—

প্রণামা শতসহস্র পূর্ব্বক নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

অগ্রজ দাদা মহাশয়! আমি বেশ ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন, তাহা লিখিবেন। নতুবা বাবা ও মা অত্যন্ত ভাবিতেছেন। আর আপনি কবে বাটীতে আসিবেন, আমি জানিতে ইচ্ছা করি এবং বোধ হয় আপনার মনে আছে, আমাকে যাহা দিবেন বলিয়াছিলেন, অবশ্য অবশ্য তাহা আনিবেন, নিবেদন ইতি ১৫ ই চৈত্র।

আপনার স্নেহের

শ্রীমতী সরোজিনী দেবী—

পত্রখানি পড়িয়া এবং হস্তাক্ষর দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ যার পর নাই বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তিনি পুনঃপুনঃ পত্রখানি দেখিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার পিতাও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সুরেন্দ্র পিতার হস্তে সেই পত্রখানি প্রদান করিয়া কহিলেন, “বাবা! দেখুন, সরোজ এত অল্পবয়সে কতদূর লেখাপড়া

শিখিয়াছে। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, উহাকে শিক্ষা দিলে আশু উন্নতিলাভ করিবে।"

রাধানাথ বাবু পত্রখানি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন।—কহিলেন, "আমি জানি, মা আমার বুদ্ধিমতী ও মেধাবিনী। যাহা হউক, এখন মা আমার নবমবর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিয়াছে, এই সময় সুপাত্রে দান করিতে পারিলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, সহসা সম্মুখস্থ ঘড়ীতে নয়টা বাজিল। তদ্দর্শনে সুরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্নানাহারাদির জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাধানাথ বাবুও সরোজিনীকে ক্রোড়ে লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরে গমন করিলেন। বহির্ব্বাটীতে কেবল রামদয়াল ভৃত্য রহিল।

বেলা সাড়ে নয়টা। সকল বালকেরাই পুস্তক হস্তে করিয়া বিদ্যালয়ে গমন করিতেছে;—কেহ বা দ্রুতপদে, কেহ বা ধীরগতিতে যাইতেছে। কেহ বা উত্তম পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গমন করিতেছে, কেহ বা সামান্য ধুতি চাদরমাত্র লইয়া যাইতেছে। কাহারও সঙ্গে ভৃত্য, কেহ বা একাকী। ধনীলোকের সন্তানেরা গাড়ীতে করিয়া গমন করিতেছে। আমাদের নলিনী দরিদ্রের সন্তান, কেবলমাত্র একখানি চাদর স্কন্ধে ফেলিয়া হস্তে পুস্তকগুলি লইয়া ধীরে ধীরে সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে উপস্থিত হইল এবং দ্বারদেশে থাকিয়াই "সুরেন্দ্র বাবু! সুরেন্দ্র বাবু!" বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। অমনি সরোজিনী বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, একটী বালক তাহার দাদাকে ডাকিতেছে। তখন সে দ্রুতপদে অন্দরে গিয়া সুরেন্দ্রের নিকট সংবাদ দিলে

তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নলিনী আসিয়া ডাকিতেছে। তখন সুরেন্দ্র তাহাকে বাটীর ভিতর আনিতে বলিলে, বালিকা পুনরায় বাহিরে গিয়া নলিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তখন সুরেন্দ্র বাবু কেবলমাত্র আহার করিতে বসিয়াছেন। নলিনীর মনোহর রূপ দর্শনে রাধানাথ বাবু ও তাঁহার গৃহিনী যার পর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহাদের মনে একরূপ নবভাবের সঞ্চার হইল, কিন্তু কেহই পরস্পর পরস্পরের নিকট সে ভাব প্রকাশ করিলেন না। পরন্তু অনিমিষনয়নে বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ আহারান্তে পুস্তকাদি লইয়া নলিনীকে সমভি-ব্যাহারে গ্রহণ পূর্ব্বক যথাসময়ে কলেজে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রাধানাথ বাবু ও তাঁহার গৃহিণী বালকের চিন্তাতেই সে দিন অতিবাহিত করিলেন।

ক্রমে দিবা অবসান হইল, চারিটা বাজিল। সরোজিনী কখন্ দাদা আসিবেন, কখন্ তাঁহার নিকট বসিয়া কথোপ-কথন করিবে, এই চিন্তাতে আকুল হইয়া একবার বহির্ব্বাটীতে গমন করিতেছে, আবার জননীর নিকট অন্তঃপুরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "মা! দাদা কখন্ আস্‌বেন?"

অবিলম্বেই সুরেন্দ্রনাথ ও নলিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জননীর আদেশে সুরেন্দ্র নলিনীকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলে গৃহিণী পুত্রনির্ব্বিশেষে আদর করিয়া নলিনীকে কিঞ্চিৎ আহারীয় প্রদান করিলে, সে তাহা ভক্ষণ করিল। অনন্তর সুরেন্দ্রনাথ বহির্ব্বাটীতে আগমন পূর্ব্বক ভৃত্যকে সমভিব্যাহারে দিয়া নলিনীকে তাহার জননীর নিকট প্রেরণ করিলেন।
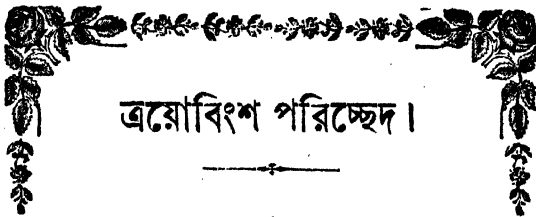
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

এ ছেলেটী কার?

রাধানাথ বাবু কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই জমীদারী মহলের এক পত্র পাইয়াছিলেন। অবিলম্বে একবার তথায় যাইবার আবশ্যক ছিল, কিন্তু স্ত্রী-কন্যার অনুরোধে সে সংকল্পে বাধা পড়ে। অগত্যা তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হয়। এখন তাঁহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আয়োজন পূর্ব্বক জমীদারীতে যাত্রা করিলেন। গমনকালে পুনঃপুনঃ সুরেন্দ্রনাথকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার বাসনা হইল, কিন্তু বলিতে পারিলেন না।—মুখ ফুটে ফুটে ফুটে না। তাঁহার অন্তরে প্রতিনিয়তই এই ভাবনা জাগরুক যে, "এ ছেলেটী কার?" এমন মোহনরূপ জগতে ত দৃষ্টিগোচর হয় না। মনে করেন জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু পারিলেন না। অগত্যা সন্দেহ-তামসীকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জমীদারীতে যাত্রা করিলেন।

লোকের মনে কোনরূপ ভাবনা চিন্তা থাকিলে যদিও তাহার প্রকৃত কারণ জানিতে না পারা যায়, তথাপি বাহ্যিক লক্ষণ দ্বারা তাহার চিত্ত যে অস্থির, ইহা অনায়াসেই

বোধগম্য হইতে পারে। রাধানাথ বাবুর চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া বাটীর সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তরে কোন বিষয়ের চিন্তা অধিষ্ঠান করিয়াছে। জমীদারী-সংক্রান্ত চিন্তাই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল; কিন্তু তাহা নহে, তিনি দিবানিশিই চিন্তা করিতেছেন, "এ ছেলেটী কার!"

রাধানাথ বাবুর গৃহিণীর দশাও ঐরূপ হইয়া উঠিয়াছে। যে দিন তিনি নলিনীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে দিন নলিনীর রূপের ছটা তাঁহার নয়নপদ্মকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, সেই দিন হইতেই তাঁহার হৃদয় স্নেহ-সলিলে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই দিন হইতেই তাঁহার চিত্ত একান্ত বিচলিত। তিনি দিবানিশিই চিন্তা করিতেছেন, "এ ছেলেটী কার?"

সুরেন্দ্র বাবুর জননী গৃহকর্ম্ম সমাপনান্তে যখনই নিশ্চিন্ত থাকেন, তখনই ঐ চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতে থাকে। তিনি একদিন মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আহা! এরূপ নয়ন-মন-প্রীতিকর সৌন্দর্য্য মনুষ্যলোকে নিতান্ত দুর্ল্লভ। আহা! যেন বিধাতা অখিল ভুবনের নির্ম্মল সৌন্দর্য্যরাশি একত্রিত করিয়া এই দেবমূর্ত্তির সৃজন করিয়াছেন। দেখিতে যেমন সুন্দর, কথাগুলিও সেইরূপ মধুমাখা—স্বভাবও যার পর নাই বিনম্র। ভাগ্যবতী না হইলে এরূপ সন্তান সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। ধন্য সেই কামিনী!—ধন্য সেই পিতা! আহা! আমার কি সেরূপ ভাগ্য হবে?—সরোজিনীকে উহার করে অর্পণ করিয়া সুখী হইব, সে আশা আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। কেনই বা না হবে?—আমি ত

সরোজের বিবাহে অর্থের কৃপণতা করিব না? জগদীশ্বরের কৃপায় আমার অর্থেরই বা তাদৃশ অভাব কি? সত্য, অর্থ হইলেই বা কি হইবে? যদি বাবুর মত না হয়? যদি নলিনী কুলে শীলে আমাদের তুল্য ঘর না হয়, তাহা হইলে আর আমার আশা ফলবতী হইবার উপায় নাই। সমান ঘর হইলেও যদি নলিনীর তাদৃশ অর্থসঙ্গতি না থাকে?—যদি দরিদ্রের গৃহে কন্যা দিতে বাবুর মত না হয়? সে জন্য তত চিন্তা করি না। আমি আগ্রহ করিয়া অনুরোধ করিলে বাবু কদাচ অমত করিতে পারিবেন না। বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে। এখন কিরূপে বালকটীর বিশেষ পরিচয় পাই? এ ছেলেটী কার?"

গৃহিণী দিবানিশি কেবল এই চিন্তাতেই ব্যাকুলিতা থাকেন। চিন্তা করিলে কি হইবে? যেখানে যাহার বন্ধন, বিধি অগ্রেই তাহার নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা মনে মনে যাহা গড়ি, যাহা ভাঙ্গি, তাহা কোনরূপেই কার্য্যকর নহে। যিনি গড়িবার কর্ত্তা, যিনি ভাঙ্গিবার কর্ত্তা, তিনিই যাহা কর্ত্তব্য, তাহা অগ্রে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

রামদয়াল বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য। রাধানাথ বাবু যখন জমীদারীতে থাকেন, রামদয়ালও তৎকালে সমভি-ব্যাহারে থাকে, কিন্তু এবার, রাধানাথ বাবু তাহাকে কলিকাতার বাটীতে রাখিয়া গিয়াছেন। রামদয়াল জাতিতে পরামাণিক। সজ্জাতি না হইলে ভদ্রলোকের বাটীতে খানসামা থাকিতে পারে না। কারণ, আবশ্যক-মতে জল—খাদ্য ইত্যাদি আনিয়া দিতে হয়। বিশেষ

পরামাণিক হইলে ভদ্রলোকের পক্ষে আরও বিশেষ সুবিধা হয়। ক্ষৌরকর্ম্মের পয়সা ব্যয়ের লাঘব হইয়া থাকে। যাহা হউক, বহুদিনের পুরাতন ভৃত্য বলিয়া রামদয়ালের বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ হইয়াছে। সে গৃহস্থের আপনার লোকের মধ্যেই যেন একজন হইয়া পড়িয়াছে। রামদয়াল প্রত্যহই মনে মনে ভাবে যে, "আমাদের সুরেন্দ্র বাবুর নিকট প্রতিদিন যে ছেলেটী আসে, এ ছেলেটী কার? দুইজনে যেরূপ প্রণয়, যেন সহোদর বলিয়া বোধ হয়। ছেলেটী প্রত্যহ আসে, আবার সুরেন্দ্রও প্রত্যহ যায়। এত প্রণয় কেন? এ ছেলেটী কার?"

রামদয়াল এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে নলিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। রামদয়াল একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সুরেন্দ্র ব্যস্তসমস্তভাবে পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া নলিনীর সহিত বিদ্যালয়ে গমন করিলেন। রামদয়াল আহারান্তে নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রিত হইল।

বেলা প্রায় সাড়ে চারিটা। এখনও রামদয়ালের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, হৃদয়ে চিন্তা থাকিলে নিদ্রা হয় না। কিন্তু রামদয়াল ইতিপূর্ব্বে বালকটীর বিষয় এত চিন্তা করিতেছিল, আর পরক্ষণেই এরূপ দীর্ঘনিদ্রা তাহাকে কিরূপে আক্রমণ করিল? ইহার কারণ রামদয়ালই বলিতে পারে।

যথাসময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও নলিনী বিদ্যালয়ের ছুটীর পর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, রামদয়াল তখনও নিদ্রাবশে অচেতন। তদ্দর্শনে সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে

আহ্বান করিতে করিতে বলিলেন, "রামদয়াল! এত শেষ বেলায় এখনও নিদ্রা যাচ্চো কেন?"

রামদয়াল চমকিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমতা আমতা করিয়া কহিল, "না বাবু! এই অল্পক্ষণ হইল শুয়েছিলেম।" সুরেন্দ্র বাবু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, নলিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় নলিনীর সহিত সুরেন্দ্র বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র কথোপকথনের পর নলিনী বিদায় লইয়া আপনার বাটীতে প্রস্থান করিল। তখন সুরেন্দ্রনাথ রামদয়ালকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামদয়াল! এ ছেলেটী কেমন বল দেখি?"

রামদয়াল কহিল, "দেখ্ছি ত বেশ শিমুল ফুলের মত, কিন্তু ভিতরে কোন গুণ আছে কি না, কে বোল্তে পারে?" রামদয়াল এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মৌনভাব ধারণ করিল। সে যে এই বালকটীর বিষয় দিবানিশি চিন্তা করে, সে মনোভাব প্রকাশ করিল না।

রামদয়ালের কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "দেখ রামদয়াল! তোমাদের কেমন একরকম স্বভাব, তোমরা পরের ছেলেকে ভাল দেখ না।"

সবিনয়ে রামদয়াল বলিল, "সে কি বাবু! আমি ত আর নিন্দা কচ্চি না। আচ্ছা বাবু! ও ছেলেটীর নাম কি?"

রামদয়াল এ যাবৎ বালকটীর নাম শ্রুতিগোচর করে

নাই। সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তোমার নামে দরকার কি? কিন্তু কথাগুলি কেমন মিষ্ট দেখেছ? আহা! হাত পা গুলি যেন মৃণালের মত কোমল, আর কেমন রক্তবর্ণ! দেখ রামদয়াল! ওরা কোন দৈবঘটনায় গরিব হয়ে পোড়েছে।"

রামদয়াল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "সকলের অদৃষ্ট কি সমান হয়? কেহ বড়মানুষ, আবার কেহ বা গরিব হয়ে থাকে। তা না হলে কি জগৎ চলে? মনে কর, তুমি বড়মানুষ হয়েছ, অনেক লোককে দান কোচ্চো; কিন্তু যদি সকলেই বড়লোক হতো, তবে কে তোমার দান গ্রহণ কত্তো? এই জন্যই ভগবান্ সকলকে বড়মানুষ করেন নাই।"

"আচ্ছা, রামদয়াল! হঠাৎ আমরা যদি বড়মানুষ থেকে গরিব হয়ে পড়ি, তা হোলে কি আমাদিগকে ঐরূপ দান নিতে হবে?"

জিহ্বা দংশন করিয়া—ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রামদয়াল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ছি বাবু! ও কথা কি বোল্‌তে আছে? তোমরা গরিব হবে কেন? মা দুর্গার ইচ্ছায় তোমরা এই রকম বড়মানুষই চিরকাল থাকবে।"

"আচ্ছা, তুমি যে বোল্‌ছিলে গরিব হোলে দান নিতে হয়, তা ঐ ছোক্‌রা ত কারো কাছে দান লয় না।"

রামদয়াল সুরেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিল, "তা তুমি কি কোরে জান্‌লে? দান না নিলে এই কলিকাতা সহরে কিরূপে চলে?"

কলে—কৌশলে নলিনীর বিশেষ পরিচয় লওয়াই রামদয়ালের উদ্দেশ্য। রামদয়ালের এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "উহার পিতার যা বিষয় আছে, তদ্দারা একপ্রকার সংসার চলে, কোন কষ্ট হয় না। তবে পিতার অদর্শন উহাদের প্রধান মনঃকষ্টের কারণ।"

রামদয়াল ব্যস্তসমস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "বালকটীর কি পিতৃবিয়োগ হয়েছে ?"

"না, উহার ভূমিষ্ঠ হইবার কতিপয় দিন পূর্ব্বেই পিতা নিরুদ্দেশ। অদ্যাপি কেহ কোন অনুসন্ধান পায় নাই।"

সবিস্ময়ে রামদয়াল জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আর আছে কে ?"

"উহার জননী আছেন, আর বাড়ীতে চাকর চাকরাণী থাকে। হীরার মা বোলে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আছে, সে বালকটীকে বড় ভালবাসে।"

রামদয়াল কহিল, "বটে! আহা! তবে ত বালকটীর প্রাণে বড় দুঃখ।"

"দেখ রামদয়াল! আমার ইচ্ছা হয়, বালকটীকে সর্ব্বদা কাছে রাখি।"

রামদয়াল তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "ক্ষতি কি ? যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে, রাখ।"

"আমি বাবাকে এ বিষয়ে পত্র লিখি। যদি তিনি অমত না করেন, তা হোলে কাছে রাখবো।"

"তবে তাঁকে পত্র পাঠাও না কেন ?"

"হাঁ, আজিই বাবাকে পত্র লিখ্‌বো।"—সুরেন্দ্র-

বাবু এই বলিয়াই অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সরোজিনী দৌড়াইয়া আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল, "দাদা! আমাকে একখানা গাড়ী কিনে দেও!"
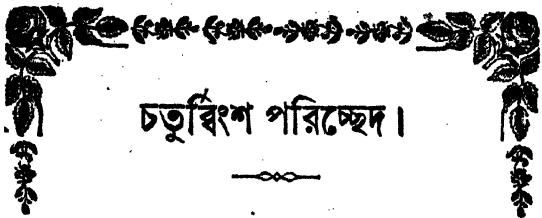
"গাড়ী কি হবে দিদি?"

সুরেন্দ্রনাথের স্নেহবাক্য শুনিয়া সরোজিনী পুনরায় বলিল, "আমি গাড়ী নিয়ে খেলা কোর্‌বো।"

"আচ্ছা, কালি কিনে দিব" এই কথা বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক শয়ন করিলেন। সুখে-সুনিদ্রায় সুপ্রভাত হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত স্বপ্ন!

চৈত্রমাস, শুক্লপক্ষ। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী! দ্বিতল অট্টালিকার উপরিভাগে একটী ক্ষুদ্রকক্ষে পালঙ্কোপরি অনুপম রমণীপদ্ম প্রস্ফুটিত। যুবতী ঘোর নিদ্রায় অচেতন! মুক্ত বাতায়নপথে ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ বায়ুহিল্লোল কক্ষমধ্যে তরঙ্গায়িত হইতেছে। রমণীর সর্ব্বাঙ্গ একখানি সূক্ষ্ম বসনে আবৃত, মুখখানিতে কোন আবরণ নাই। ওষ্ঠাধরে বিন্দু বিন্দু স্বেদোদ্গম হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, কমলদলোপরি নীহারবিন্দু শোভা পাইতেছে। নিদ্রাবস্থায় রমণী একবার মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া উঠিলেন, পরক্ষণেই আবার মুখখানি মলিন হইয়া পড়িল। আবার মস্তক সঞ্চালন করিলেন, পরক্ষণেই হস্ত প্রসারণ করিলেন, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হইল না। গভীর নিদ্রাবশে নানারূপ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

পাঠক-মহাশয়গণ যুবতীকে বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন। রমণী অপর কেহই নহে, নলিনীর জননী দুঃখিনী বসন্তলতা। বসন্তলতা পালঙ্কোপরি শয়ান হইয়া নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিতেছেন, নিম্নে গৃহমধ্যে শয্যায় হীরার মা শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

বসন্তলতা চতুর্দ্দশ বৎসর পতিহারা হইয়া কালযাপন করিতেছেন।* পাছে দুঃখ প্রকাশ করিলে মলিন মুখ দেখিয়া নলিনীর প্রাণে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় একদিনের জন্যও বহির্ভাগে পতিশোকের কোনরূপ চিহ্ন প্রদর্শন করেন নাই, ধৈর্য্যসহকারে তাহা হৃদয়গুহায় নিহিত রাখিয়াছেন। এত দিনের পর আজি স্বপ্নযোগে সেই হৃদয়েশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন। বহু-দিনের পর পতিকে দেখিয়া যেন বলিয়া উঠিলেন, "নাথ! এসো!—তোমার কেমন পুত্র হয়েছে দেখ!—কোলে করিয়া জীবন সার্থক কর।" যখন পতিকে এই সকল কথা বলিতেছেন, তখনিই মুখখানি হাস্যময় হইয়া উঠিল। তিনি যেমন পতির দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি স্বামী তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া গেল। সেই সময়েই যুবতীর মুখপদ্ম মলিনভাব ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে পতি অন্তর্হিত হইলেন। তখন যেন একজন জটাজূটমণ্ডিত দীর্ঘশ্মশ্রু সন্ন্যাসী ললাটে রক্তত্রিপুণ্ড্রক ও করে লৌহচিমটা ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, "বসন্ত! আর তোমার চিন্তা নাই। তুমি এই চতুর্দ্দশ বর্ষ যে পতিপদ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছ, তোমার সেই আরাধ্য হৃদয়েশ্বর আমার নিকটেই আছেন। তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। তিনি রাত্রিযোগে নদী-গর্ভে নিপতিত হইয়া বহুদূরে নীত হইলে আমিই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছি। আমার আদেশেই তিনি এতদিন তোমার নিকট উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি অচিরেই স্বামীসুখে পরম সুখিনী হইবে। আরও শুন, তোমার পিতামাতা দেহত্যাগ করিয়া শিবলোকে

গমন করিয়াছেন। কাশীধামে তোমার পিতার মৃত্যু হইলে জননীও সহগামিনী হইয়া নারীকুলের আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন।” এইরূপ স্বপ্ন দেখিবামাত্র—জনক-জননীর মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র বসন্ত-লতা নিদ্রার ঘোরে অমনি চীৎকারস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। হীরার মা চমকিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক “বৌ দিদি! বৌ দিদি!” বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

তৎক্ষণাৎ বসন্ত-লতার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। হীরার মা বৌদিদির নিকট ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বসন্ত-লতা স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া সকাতরে কহিলেন, “হীরার মা! দেখিতে দেখিতে প্রায় চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইল, আমি তোমার দাদাবাবুকে হারাইয়াছি, কিন্তু একদিনের জন্য আমার মন এত বিচঞ্চল হয় নাই। আমি নলিনীকে পাইয়া—নলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া—নলিনীর মুখ দেখিয়া সে শোক বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। কিন্তু আজি আমার মন এরূপ হইতেছে কেন? বোধ হয়, আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। আর আমার জীবনের আশা নাই। মরিলে সকল যন্ত্রণার শেষ হয় সত্য, কিন্তু মৃত্যুকালে একবার তাঁহার চরণ দর্শন ভাগ্যে ঘটিবে না, এই দুঃখই চিরদিনের জন্য থাকিয়া গেল। যদি তিনি একদিনের জন্য আসিয়াও আমার বাছা নলিনীকে ক্রোড়ে করিতেন,—যদি তাহা দেখিয়া তদ্দণ্ডেই আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলেও পরম সুখবোধ করিতাম। কিন্তু আমি যার পর নাই অভাগিনী, আমার অদৃষ্টে সে আশা দুরাশামাত্র।”

সরলহৃদয়া হীরার মা প্রবোধবাক্যে বসন্ত-লতাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, “বৌ দিদি! স্থির হও, আর তোমার চিন্তা নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, দাদাবাবু শীঘ্রই আসিয়া

তোমাকে সুখী করিবেন। তুমি যেরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমিও সেইরূপ দেখিতে ছিলাম। মোহনগড়ে যে সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, যাঁহার বরে তুমি গুণনিধি নলিনীকে প্রাপ্ত হইয়াছ, যেন সেই সন্ন্যাসী আমার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন, "বুড্ডা মায়ী! আমার বরে তোর বৌদিদির পুত্র জন্মিয়াছে, আবার আমার কৃপাতেই তোর দাদাবাবুর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। তুই নলিনীকে একবার আমার নিকটে প্রদান কর্।" এই কথা শুনিয়া যেমন আমি নলিনীকে তাঁহার হস্তে দিব, অমনি তুমি রোদন করিয়া উঠিলে, আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। অতএব রোদন করিও না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অচিরেই দাদাবাবু আসিয়া সকল দুঃখের অবসান করিবেন।"

দেখিতে দেখিতে নিশা প্রভাত হইল। কোকিলেরা ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। হীরার মা হরিনাম স্মরণ পূর্ব্বক গৃহকর্ম্ম সমাধানার্থ বাহির হইল। বসন্ত-লতা পালঙ্কোপরি শয়ান হইয়া চিন্তাদেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

আশাপথ।

সাগরতীরে নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র আশ্রম,—একখানিমাত্র পর্ণকুটীর। কুটীরাভ্যন্তরে একটী যোগীবর বদ্ধপদ্মাসন হইয়া মুদিতনয়নে পরম-পিতার ব্রহ্মপদ চিন্তা করিতেছেন। দেখিলেই বোধ হয়, যেন, অচল মূর্ত্তি,—চেতন নাই। অপর একটী যুবা উন্মী-লিত নয়নে যোগীর সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন। যোগী-বর কখন্ কি অনুমতি করেন, কখন্ তাঁহার আদেশ পালন করিতে হইবে, যেন এই প্রতিজ্ঞাতেই যুবা উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার মুখখানি দেখি-লেই চিন্তাকুল বলিয়া বোধ হয়;—যেন তাঁহার বদন-পদ্মখানি বিষাদ-রাহুতে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে।

পাঠকমহাশয়েরা এই আশ্রমবাসী মহাত্মাদ্বয়কে চিনিতে পারিয়াছেন? ইঁহারা অপর কেহই নহেন, যিনি চক্ষু মুদিত করিয়া ধ্যানযোগে সমাসীন আছেন, তিনিই সেই সন্ন্যাসী, আর তাঁহার পুরোবর্ত্তী যুবাই বসন্ত-লতার পতি নীরদবাবু। পাঠকমহাশয়দিগকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সন্ন্যাসী মোহনগড় পরিত্যাগ করিয়া সাগরমূলে

বনমধ্যেই আশ্রম নির্দ্দেশ করেন। পরে নীরদবাবু ভাসিতে ভাসিতে তথায় উপস্থিত হইয়া যোগীর নয়ন-পথে নিপতিত হন। সন্ন্যাসীবর কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ পূর্ব্বক আপনার নিকটেই রাখিয়াছেন।

নীরদবাবুর মন আজি একান্ত চঞ্চল। আপন জীবন-কাহিনী ভাবিতে ভাবিতে বসন্ত-লতার কথা মনে পড়িল,—দর দর ধারে নয়নপদ্ম হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হায়! আমার ন্যায় পাপাত্মা জগতে আর নাই। জন্মান্তরে কত পাপ করিয়াছিলাম, তাহার ফলেই এখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হৃদয়ে দগ্ধবিদগ্ধ হইতেছি। আমার জন্যই অবলা বসন্তলতা জন্মদুঃখিনী। আহা! অভাগিনী আমাকে ভিন্ন জগতে আর কাহাকেও জানে না। কেন আমি তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমার হস্তে না পড়িলে হয় ত সে জগতে পরম সুখিনী হইত। আহা! অভাগিনী কি জীবিতা আছে? যেরূপ উৎকট পীড়ায় সময়ে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসি-য়াছি, তাহাতে জীবনের আশা একান্ত অসম্ভব। তবে যোগীবর বলিয়াছেন যে, তোমার প্রণয়িনী জীবিতা আছেন। যদি সত্য হয়, তবে ত তাহার কষ্টের পরিসীমা নাই। কে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে?—কাহার মুখ দেখিয়া অভাগিনী প্রবোধ প্রাপ্ত হইবে? যদি একটী সুসন্তান জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলেও দুঃখিনীর পক্ষে কিয়দংশে মঙ্গল হইতে পারে। যদি তাহা না হইয়া থাকে?—যদি গর্ভস্থ শিশুর কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে? তাহা হইলে দুঃখিনী উন্মাদিনী

হইয়া আত্মঘাতী হইবে সন্দেহ নাই। এ জীবনে কি একবার তাহার দর্শন প্রাপ্ত হইব না? জগতে সুখ দুঃখ চক্রাকারে প্রতিনিয়ত ঘুরিতেছে। আমার এ দুঃখচক্র কি ঘুরিয়া যাইবে না?—জীবনে কি আর একবারও সুখশান্তির দর্শন পাইব না? যোগীবর বলিয়াছেন, সময় হইলে আমাকে বিদায় দিবেন;— উপযুক্ত সময়ে আমি প্রিয়তমার দর্শন পাইব। তাঁহার কথা মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দশ বর্ষ অতীত হইতে চলিল, আর কত দিনে সে সময় উপস্থিত হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। কতদিন আশাপথ চাহিয়া থাকি? সেই অভাগিনীই বা পতি-হারা হইয়া কতদিন জীবনধারণ করিতে পারিবে? যখন দুঃখিনীর উৎকট পীড়া হয়, তখন নরেন্দ্রবাবুকে সংবাদ দিয়াছিলাম। যদি নরেন্দ্রবাবু রাজনগরে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য অভাগিনীর কোন না কোনরূপ উপায় হইয়াছে। হীরার মা ও বামুনদিদি, তাহারা উভয়ে যে প্রকৃতির লোকই হউক্ না কেন, বসন্ত-লতার শুশ্রূষার জন্য জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।"

নীরদবাবু চিন্তাকুলিত-হৃদয়ে এইরূপ আন্দোলন করিতেছেন, অকস্মাৎ যোগীবরের বদনদেশ হইতে গভীররবে উচ্চারিত হইল, "শিব শম্ভো!" তাঁহার ধ্যান-ভঙ্গ হইল। তিনি ঘোররবে "নীরদ" বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র নীরদবাবুও অধিকতর পুরোবর্ত্তী হইলেন। যোগীবর জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীরদ! কিছু কি চিন্তা করিতেছ?"

করযোড়ে নীরদবাবু উত্তর করিলেন, "প্রভু! চিন্তার

কি আর বিরাম আছে? প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইল, আপনার চরণাশ্রয়ে বাস করিতেছি, এই দীর্ঘকালে চিন্তায় চিন্তায় আমার হৃদয় পাষাণ হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু আজি যেরূপ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ আর একদিবসের জন্যও হয় নাই। এখন আপনার পাদপদ্মে নিবেদন এই যে, সময় কি এখনও হয় নাই? আর কত দিনে সময় উপস্থিত হইবে? আমি কি দুঃখিনী প্রিয়তমার দর্শন এ জীবনে পাইব না?"

যোগীবর কহিলেন, "নীরদ! তুমি একদিন আমার নিকট এই কথা নিবেদন করিয়াছিলে, কিন্তু এই চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে আর কখনও উত্থাপন কর নাই। আজি হঠাৎ এত চঞ্চল হইলে কেন?"

নীরদবাবু কহিলেন, "প্রভু! কেন যে আজি আমার মন এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, বলিতে পারি না। আমার বোধ হইতেছে, সে অভাগিনী আর জীবিতা নাই।"

বলিতে বলিতে নীরদের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল,—বাষ্পবারিতে নয়নযুগল পরিপূর্ণ হইল। তদ্দর্শনে যোগীবর কহিলেন, "বৎস! স্থির হও, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আর অত্যল্পমাত্র দিন অবশিষ্ট আছে, অল্পদিনের মধ্যেই তুমি বিদায় প্রাপ্ত হইবে। তখন তুমি তোমার প্রণয়িনীকে দেখিবার বাসনা পূর্ণ করিও। এখন যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি যতক্ষণ না আসি, এই স্থানে অবস্থিতি কর।" যোগীবর এই বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ত্বরিতগতিতে প্রস্থান করিলেন।

নীরদবাবু আবার চিন্তাসাগরে ডুব দিলেন। যোগীবর বলিলেন যে, অত্যল্পদিনের মধ্যেই সময় আগত হইবে।

চতুর্দ্দশবর্ষ অতীত হইয়াছে, আবার যে কতদিন অতীত হইবে, কে বলিতে পারে? কি করিবেন, অগত্যা আশাপথ চাহিয়া রহিলেন।

অকস্মাৎ একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব শব্দ নীরদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি অকস্মাৎ চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বনমধ্যে বাস করিতেছেন, একদিনের জন্যও যোগীবর ব্যতীত অন্য মূর্ত্তি দর্শন বা অন্য কোন প্রাণীর স্বর শ্রবণ করেন নাই। আজি অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণে সংগীতধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি হতবুদ্ধির ন্যায় চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন, হয় ত যোগীবর অদূরে থাকিয়া ঈশ্বরের গুণ গান করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে স্বর অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইল, দেখিতে দেখিতে অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তির আবির্ভাব! তাঁহার লাবণ্য দর্শনে—দিব্যজ্যোতিঃ নিরীক্ষণে নীরদের মন বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল। তিনি নিশ্চল হইয়া চিত্তপুত্তলিকাবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রমণীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে নীরদের পুরোবর্ত্তিনী হইয়া মধুরবচনে কহিলেন, "বৎস! ভয় নাই। আমি বনদেবী। এই বনরাজ্য আমারই অধিকারভুক্ত। যোগীবরের প্রসাদেই আমি তোমাকে দর্শন প্রদান করিলাম। যোগীবর আর এ আশ্রমে আগমন করিবেন না। তিনি তোমার ভার আমার প্রতিই বিন্যস্ত করিয়াছেন। আর পাঁচদিন পরে আমি তোমাকে বিদায় প্রদান করিব। তখন তুমি তোমার আত্মীয়জনের নিকট গমন করিতে পারিবে। এতদিন—এত

দীর্ঘকাল যে কষ্টে—যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ, আর পাঁচ দিন পরে সেই কষ্টের, সেই যন্ত্রণার পরিবর্ত্তে অতুলনীয় স্বর্গোপম সুখ অনুভব করিবে। আমার কথায় অবিশ্বাস করিও না। মনকে দৃঢ়রূপে সংযত করিয়া রাখ।

এই পাঁচদিন তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, আমিই তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তুমি এই স্থানেই অবস্থিতি কর। আমি সময়ে সময়ে তোমাকে দর্শন প্রদান করিব।” বনদেবী এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।
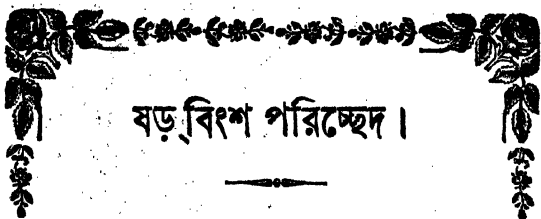
ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

দেখিতে দেখিতে চারি দিন অতীত। অদ্য পঞ্চম দিবস। নীরদ বাবু একান্তে বসিয়া একমনে চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একেবারেই তিরোহিতপ্রায়। সহসা বনদেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন;—দেখিলেন, নীরদ মুদিতনেত্রে নিস্পন্দভাবে কি চিন্তা করিতেছেন। তাঁহাকে তদবস্থ দর্শনে বনদেবী কহিলেন, "বৎস! বৎস নীরদ!"

নীরদ বাবু নিরুত্তর! যেন চৈতন্যবিহীন! তাঁহার সেই ভাব দর্শনে বনদেবী বিস্মিত হইয়া পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "বৎস নীরদ! বৎস!"

নীরদ অমনি চমকিত হইয়া নেত্র উন্মীলন পূর্ব্বক উত্তর দিলেন, "মা! কেন মা!"

"কেন বাছা আজি এরূপ চিন্তিত অবস্থায় রহিয়াছ?" —আদরমাখা মিষ্টকথায় বনদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বাছা আজি এরূপ চিন্তিত অবস্থায় রহিয়াছ?"

বিনয় সহকারে করযোড় করিয়া নীরদবাবু কহিলেন, "মা! আমি এই কয়েকদিবস দিবানিশি কেবল চিন্তা

করিতেছি যে, যিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, যাঁহার আশ্রয়ে এই চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত করিলাম, তিনি প্রতারণা করিয়া এ দাসকে পরিত্যাগ করিলেন। এ অধম মহাপাপী, নচেৎ তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত হইলাম কেন? আমি এরূপ মহাত্মাকে পাইয়া অবহেলে হারাইলাম। মা! এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই আমার মন একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।”

বনদেবী কহিলেন, “বৎস! চিন্তা করিও না, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আমি যোগীবরের নিকট তোমার বিষয় সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি। তুমি রাজনগরে বাস কর, তাহাও শুনিয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তোমার সমস্ত ভার এখন আমারই উপর নির্ভর রহিয়াছে। এখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত। আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছামত স্থানে পাঠাইয়া দিব। কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এখান হইতে রাজনগর প্রায় অশীতি-ক্রোশ অন্তর। পদব্রজে গমন করিলে দশদিনেরও অধিক সময় অতীত হইবার সম্ভব। অতএব কোন্ স্থানে যাইতে বাসনা হয় বল।”

আনন্দে নীরদবাবু অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চিত্ত যেন পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ আনন্দসাগর দেখিতে লাগিল। চতুর্দ্দশবর্ষ যাঁহার সহিত একত্র বাস করিলেন, ক্ষণকাল পূর্ব্বে যাঁহার জন্য চিন্তাকুল হইয়া বনদেবীর নিকট এত বিলাপ প্রদর্শন করিলেন, দেখিতে দেখিতে তৎসমস্ত তাঁহার হৃদয় হইতে তিরোহিত হইল। তিনি মায়াময় সংসারে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। সংসার তাঁহার মনে পড়িল, হৃদয়ে প্রিয়তমার প্রতিমূর্ত্তি জাগিয়া

উঠিল,—তাঁহার দর্শনলালসাই বলবতী হইল। বসন্ত-লতার গর্ভে কি সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে, কতক্ষণে তাহার বদনপদ্ম দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন, কতক্ষণে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া অঙ্গ শীতল হইবে, এই চিন্তাই তাঁহাকে একান্ত সমুদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। বনদেবীর মুখে শুনিলেন, রাজনগর প্রায় অশীতি ক্রোশ অন্তর। কি উপায়ে স্বদেশে উপস্থিত হইবেন, কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে বনদেবী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! নীরব রহিলে কেন? কোন নগরে যাইতে কি ইচ্ছা হয়?"

নীরদ বাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন, "দেবি! নগরে প্রবেশ করিতে পারিলে পরে আমি যেরূপে হয় স্বদেশে যাইতে পারিব।"

বনদেবী কহিলেন, "তবে কোন্ নগরে যাইতে ইচ্ছা হয়?"

"আপনার যেখানে ইচ্ছা আমাকে পাঠাইয়া দিউন্। যে কোন নগরে উপস্থিত হইলেই আমি যাইতে পারিব।"

অধিক আনন্দ জন্মিলে মনের স্থিরতা থাকে না। নীরদবাবু অধীর হওয়াতে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। নতুবা বনদেবীর অসাধ্য কি আছে? তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি অনায়াসে নীরদকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু নীরদ মনের চাঞ্চল্য বশতঃ কিছুমাত্র স্থির করিতে না পারিয়া কহিলেন, "যে কোন নগরে উপস্থিত হইলেই আমি যাইতে পারিব।"

বনদেবী এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, অদ্য তুমি আহারাদি সমাপন করিয়া নিদ্রিত থাক, প্রত্যূষে

নগরে উপস্থিত হইতে পারিবে।” এই বলিয়া নানাবিধ আহারীয় প্রদান পূর্ব্বক বনদেবী তিরোহিত হইলেন।

যে কয়দিন যোগীবর প্রস্থান করিয়াছেন, বনদেবীই সেই কয় দিবস নীরদের আহারাদি প্রদান করেন। অদ্যও সেইরূপ সমর্পণ করিয়াছেন। আজ আর নীরদের ক্ষুধা নাই,—তৃষ্ণা নাই। তাঁহার হৃদয় আনন্দে প্রফুল্ল! তিনি যৎকিঞ্চিৎ আহারাদি করিয়া নিশাকালে পূর্ব্ববৎ কুশ-শয়নে শয়ন করিলেন। চিন্তায় চিন্তায় নিশা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইল। তখন নিদ্রাদেবী তাঁহাকে আক্রমণ করিলে নীরদবাবু ক্রমে ক্রমে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন।

যখন রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটা, তখন হঠাৎ নীরদ-বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চারিদিকে নেত্রপাত করিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন, সে বন নাই, সে কুটীর নাই, সে সকল বৃক্ষলতাদিও কিছুই নাই। চারিদিকে ছোট বড় নানাপ্রকারের অট্টালিকা এবং চারিদিকে আলোকমালা সুসজ্জিত। তদ্দর্শনে তাঁহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। ক্ষণকাল স্থিরচিত্তে নিস্তব্ধ-ভাবে অবস্থান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; বুঝিতে পারিলেন, বনদেবীই মায়াবলে তাঁহাকে কোন নগরে প্রেরণ করিয়াছেন। তখন করুণাময় জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া উদ্দেশে বনদেবীকে ও যোগীবরকে প্রণাম করিলেন।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল। বিহঙ্গকুল উষাসমাগমে প্রফুল্ল হইয়া বিভুগুণগানে প্রবৃত্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে যে সকল আলোকমালা নীরদের নেত্রে পতিত

হইয়াছিল, নিয়মিত লোকেরা আসিয়া তাহা নির্ব্বাণ করিয়া দিল। নীরদ বাবু দেখিলেন যে, তিনি একটী বৃহৎ বাটীর বহির্ভাগস্থ উচ্চ সোপানোপরি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তখন তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে গাত্রোত্থান করিয়া রাজপথে বহির্গত হইলেন। দেখিতে দেখিতে অসংখ্য লোকের—অসংখ্য শকটের সমাগম। নীরদ বাবু কোথা আসিয়াছেন, কোথায় যাইবেন, কিছুই জানেন না, কিছুরই স্থিরতা নাই। তাঁহার পরিধান অতি জীর্ণ মলিন বসন। এ অবস্থায় কোন ভদ্রলোকের নিকট উপস্থিত হইলে নিতান্ত ঘৃণা করিতে পারে, এই ভাবিয়া নীরদের হৃদয়ে নির্ব্বেদ সঞ্চার হইল। তিনি ধীরে ধীরে একটী পথিকের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! এটী কোন্ সহর?"

পথিক অবাক্ হইয়া ক্ষণকাল নীরদ বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। পরে হাস্য করিয়া কহিল, "সে কি? তুমি কোথায় আসিয়াছ, তাহাই জান না? ইহারই নাম কলিকাতা।"

কলিকাতার নাম শুনিয়া নীরদ বাবুর হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। তিনি পূর্ব্বে অনেকবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সহজে সকল স্থান চিনিয়া উঠা একান্ত দুরূহ। নীরদ বাবু পুনরায় বিনয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! মালাপাড়া কোন্ দিকে?"

পথিক বলিল, "তুমি যখন কিছুই জান না, তখন কোন্ সাহসে কলিকাতায় আসিয়াছ? যাহা হউক, এই

পথ দিয়া বরাবর উত্তরমুখে বহুদূর গমন করিলেই শ্যামবাজারের নিকট উপস্থিত হইবে। সেইখানে বাগ্‌-বাজার মালাপাড়া বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই কেহ না কেহ দেখাইয়া দিবে।”

নীরদ বাবু ভাবিতে ভাবিতে উত্তরাভিমুখে চলিলেন। পরিচ্ছদ যেরূপ মলিন, শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে হঠাৎ ভদ্রলোকের বাটীতে প্রবেশ করিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয়। এই চিন্তাতেই তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে গমন করিলে হেদুয়া দীঘি তাঁহার নয়ন-পথবর্ত্তী হইল। তখন তিনি শ্রান্তিদূর মানসে দীঘির একটী সোপানোপরি বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।
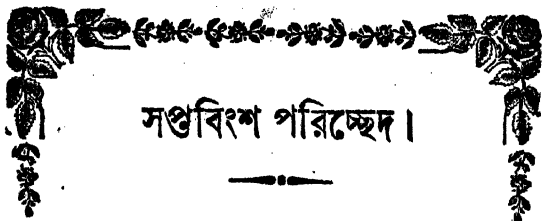
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাব প্রকাশ।

রাধানাথ বাবু জমিদারীমহলে গিয়াছেন, জমিদারী-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনঃসংযোগ হয় না। তাঁহার মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, সর্ব্বদাই চিন্তাকুল। নিরন্তরই ভাবিতেছেন, সে ছেলেটী কার? তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যদি সেই ছেলেটীর সঙ্গে সরোজিনীর বিবাহ হয়, তাহা হইলেই যেন আমি জীবন সার্থক করি।—তাহা হইলে যেন ঠিক হরগৌরী-মিলন হয়। কিন্তু বালকটী আমাদিগের স্বঘর কি না, তাহাই বা কিরূপে জানিব? যদি স্বঘরও হয়, তাহা হইলেও যে বাসনা পূর্ণ করিতে পারি, তাহারও সম্ভব নাই; আমার একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ;—সুরেন্দ্র আজ্ঞাবহ, বোদ্ধা ও সচ্চরিত্র। আমি তাহার অমতে কোন কাজে হস্তার্পণ করিতে পারিব না। যদি এ বিষয়ে সুরেন্দ্রের মত না হয়?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মন দিন দিন সমুদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। জমিদারীকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ সমাপ্ত না হইতে হইতেই তিনি কলিকাতায় পুনরাগমনের মানস

করিলেন। প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতি জমিদারীর ভারার্পণ করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিতে হইল।

রাধানাথ বাবু যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বেলা প্রায় এগারটা। সুরেন্দ্র বাবু কলেজে গমন করিয়াছেন। পিতাকে দেখিয়া সরোজিনীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সে হাসিতে হাসিতে নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র রাধানাথ বাবু ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আহারাদি সমাধান করিয়া রাধানাথ বাবু গৃহমধ্যে বসিয়া অধোবদনে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে যেন চিন্তাকুল বোলে বোধ হচ্চে। ইহার কারণ কি? জমিদারীতে ত কোন গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই?"

"না, তবে আমি সমস্ত কাজ শেষ করিয়া আসিতে পারি নাই;—কর্ম্মচারীর প্রতি ভার দিয়া আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া গৃহিণী পুনরায় কহিলেন, "ভাল, একটী কথা বলি, সকল কাজের জন্যই ত ভাবনা কর, আমার সরোজের জন্য কি একদিনের জন্যও চিন্তা কর না? দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাছা আমার বড় হয়ে উঠেছে, এই সময় একটী সুপাত্র খুঁজে বিবাহ দেওয়া কি ভাল নয়?"

"আমি ত দিবানিশিই ঐ কথা ভাবিতেছি।—আমার মনে ঐ চিন্তা ভিন্ন অন্য ভাবনা আর কিছুই নাই। আচ্ছা, তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, সুরেন্দ্রের নিকট যে ছেলেটী আসে, তাহারা কি আমাদের উপযুক্ত

ঘর? বিষয় সম্পত্তি কেমন আছে? তার সঙ্গে সরোজের বিবাহ হইলে বেশ মনের মত হয়। ছেলেটী যেমন রূপের সাগর, তেমনি বিনম্র স্বভাব। আহা! কথাগুলি যেন মধুমাখা!"

পতির এই বাক্য শুনিয়া গৃহিণী উত্তর করিলেন, "তা আমি কি কোরে বোল্‌বো? সুরেনের কাছে আসে, তাই জানি। কার ছেলে, কেমন ঘর, বিষয় আশয় আছে কি না, কিছুই বোল্‌তে পারি নি। তবে ছেলেটী দিব্বি পরিপাটী! সরোজকে উহার হাতে দিলে আমারও মনের মত হয়।—তা, আমার মতে ত আর কাজ হবে না।"

রাধানাথ বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, সুরেন কি তোমাকে কখন কিছু বলে নাই? তুমি কি কখন জিজ্ঞাসা কর নাই যে, ছেলেটী কার?"

"না, আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি নি। তবে এই দেখ্‌তে পাই, সুরেনের সঙ্গে যেমন ভাব, যেন দুজনে সহোদর ভাই।"

রাধানাথ বাবু কিঞ্চিৎ মৌনভাবে থাকিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, একবার রামদয়ালকে ডাক ত। যদি সুরেন কথায় কথায় রামদয়ালের কাছে কিছু প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা জানি।"

আদেশমত গৃহিণী দাসী দ্বারা রামদয়ালকে ডাকাইলে, সে তৎক্ষণাৎ বহির্ব্বাটী হইতে অন্তঃপুরে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল। রাধানাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রামদয়াল! যে ছেলেটী সুরেন্দ্রের কাছে সর্ব্বদা আসে, তুমি জান যে, সে ছেলেটী কার?"

করযোড়ে বিনয় করিয়া রামদয়াল উত্তর করিল, "বাবু! কতক কতক শুনেছি বটে। ওটা বামুনদের ছেলে কিন্তু বড় গরিব।"

রাধানাথ বাবু এই কথা শুনিয়া আরও কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন, রামদয়ালও একে একে তাহার উত্তর দিতে লাগিল। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা রামদয়াল ছেলেটীর কি মা বাপ নাই?"

"পিতা মাতা আছেন বটে, কিন্তু বাপ থেকেও না থাকার মধ্যে।"

"সে কেমন?"

"বাবু! ছেলের জন্মের আগেই বাপ নিরুদ্দেশ, কেহই কোন অনুসন্ধান পায় নাই।"

"তবে এখানে থাকে কোথা?—কার কাছে থাকে, চলেই বা কিরূপে?"

"বাবু! সে অনেক কথা। কেন সুরেন বাবু কি আপনাকে পত্র লেখেন নি?"

"কৈ, না, আমি ত কোন পত্রাদি পাই নাই। কেন, কিসের পত্র?"

"ঐ ছেলেটীকে সুরেন বাবু বড় ভালবাসেন। সে দিন আমাকে বোল্লেন যে, ও ছেলেটীকে কাছে এনে রাখতে ইচ্ছা হয়।" তা আমি বোল্লেম যে, যদি তা ইচ্ছা হয়, রাখুন। তাই শুনে সুরেন বাবু বোল্লেন যে, বাবার অমতে ত পারি না, বাবার কাছে আজ এ বিষয়ে পত্র লিখবো, তাঁর মত হ'লে তার পর যা হয় করা যাবে।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, হঠাৎ সরোজিনী দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, "বাবা! দাদা

আস্‌ছেন। সরোজিনী পার্শ্বের বাটীতে প্রতিবাসিনী বালিকার সহিত খেলা করিতেছিল, অদূরে সুরেন্দ্র বাবু আসিতেছেন দেখিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া পিতার নিকট আসিয়াছে। সে পিতার নিকট ঐ কথা বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির বাটীতে একেবারে তাহার দাদার নিকট উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্র বাবু অমনি হাসিতে হাসিতে তাহার হাত ধরিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নলিনীও সুরেন্দ্রের সমভিব্যাহারে ছিল, সে বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সুরেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতৃপদে প্রণাম করিয়া তাঁহার কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! এত শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়াছেন, জমিদারীর কাজকর্ম্ম সমস্ত দেখাশুনা হইয়াছে ত?"

রাধানাথ বাবু পুত্রের মুখচুম্বন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "হাঁ বাবা! একপ্রকার শেষ হইয়াছে বটে, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, কর্ম্মচারীর প্রতি ভারার্পণ করিয়া আসিয়াছি। সে যাহা হউক, এখন তুমি হস্তমুখ ধৌত করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ কর।"

"না, এখন কিছু আহার করিব না, সময় নাই। নলিনী আমার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহাদিগের বাটীতে একবার যাইব।"

রাধানাথ বাবু এই কথা শুনিয়া কহিলেন, "আজি তুমি একজন ভৃত্যকে সঙ্গে দিয়া নলিনীকে গৃহে পাঠাও, কালি বরং উহাদের বাটী যাইও।"

পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা সুরেন্দ্রের অভিপ্রেত নহে। তিনি অগত্যা বাহিরে আসিয়া মিষ্টবাক্যে নলিনীকে

বিদায় প্রদান করিলে, নলিনীও ভৃত্যসহ গৃহে প্রস্থান করিল।

এদিকে সুরেন্দ্রনাথ ক্ষণকাল বিশ্রামাদি করিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলে রাধানাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা সুরেন্দ্র! সরোজিনী দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া উঠিয়াছে, এই সময় সুপাত্রসাৎ করাই যুক্তিযুক্ত। আমি সরোজের ভাবনা ভাবিয়া এত তাড়াতাড়ি জমিদারী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি ত কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কোথায় সুপাত্র পাইব, কিছু বুঝিতে পারি না। তোমার মত কি?—কি করা যায়?"

সুরেন্দ্র বাবু ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া সবিনয়ে কহিলেন, "আচ্ছা, আমার কাছে ঐ যে নলিনী বোলে ছেলেটী আসে, ওটীকে কি ভাল বোধ হয় না? আমি এ কথা আপনার কাছে সাহস কোরে বোল্‌তে পারি নি। যদিও কোন দৈব কারণে উহারা এখন দরিদ্র হয়েছে, তথাপি ভবিষ্যতে উহাদের এরূপ কষ্ট থাক্‌বে না। বালকটী মেধাবী—বুদ্ধিমান্‌, লেখাপড়াতেও বেশ অনুরাগ আছে। আমার বিবেচনায় নলিনী সরোজিনীর উপযুক্ত পাত্র।"

সুরেন্দ্রের কথা শুনিয়া রাধানাথ বাবুর বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল! তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ সুরেন! আমি প্রথম যেদিন ঐ ছেলেটীকে দেখি, সেই দিন থেকেই আমার স্নেহের সঞ্চার হয়েছে, সেই দিন থেকেই আমার মন চঞ্চল হয়েছে। সেই দিনই ইচ্ছা কোরেছি যে, সরোজিনীকে উহার হস্তে সমর্পণ কোরে সুখী হই; কিন্তু পাছে তোমার অমত হয়, পাছে

তোমার গর্ভধারিণী অসন্তুষ্ট হন, এই আশঙ্কায় কোন কথা প্রকাশ করি নাই। এখন যখন জানতে পাল্লেম, তোমার মত আছে, গৃহিণীর মত আছে, রামদয়ালের মত আছে, সকলেরই মত আছে, তখন এই যুক্তিই সার হ'লো। এখন তুমি এক কাজ কর, তুমি কল্য প্রাতে নলিনীর জননীর কাছে গিয়ে তাঁর অভিপ্রায় জেনে এসো।"

সুরেন্দ্রনাথ পিতার এই কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "দেখুন, আগে নলিনীর মত জানা যাক্, তার পর তার জননীর মত জান্‌বো।"

"আচ্ছা, তাহাও ভাল, কিন্তু নলিনীর মত জানবে কিরূপে?"

"তার অনেক উপায় আছে।"

"ভাল, কি উপায়ে বুঝ্‌বে বল দেখি?"

হাস্য করিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "আমি নলিনীকে সরোজিনীর পড়া বোলে দিতে অনুরোধ কোর্‌বো। নলিনীর সঙ্গে সরোজিনীর কথাবার্ত্তা হোলে অনায়াসে মনের ভাব—পরস্পরের প্রণয়ভাব জানা যাবে।"

এইরূপ কথোপকথনে ক্রমে রাত্রি হইতে চলিল দেখিয়া রাধানাথবাবু সুরেন্দ্রকে আহারাদি করিতে বিদায় দিলেন এবং নিজেও যথানিয়মে আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সরোজিনীর ভাবনা ভাবিয়া সহজে সেদিন তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। যখন রাত্রি প্রায় একটা, তখন তন্দ্রা আসিল। দেখিতে দেখিতে রাধানাথবাবু চেতনাহীন! দেখিতে দেখিতে রজনী প্রভাত হইল।

প্রভাতে সুরেন্দ্রনাথ নলিনীর বাটীতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, অকস্মাৎ নলিনী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ সমাদর সহকারে তাহাকে বাহিরের বৈঠকখানায় বসাইলেন। অনতিবিলম্বেই সরোজিনী সহাস্যবদনে পুস্তক হস্তে দাদার নিকট উপস্থিত হইল। সে প্রত্যহই প্রভাতে সুরেন্দ্রবাবুর নিকট বসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত। সে দিন সুরেন্দ্রবাবু নলিনীকে কহিলেন, "ভাই! তুমি আজি সরোজিনীর পড়া বোলে দেও। আমি একবার অন্দরে পিতার কাছ থেকে আসি।"

সুরেন্দ্রনাথ এই বলিয়া প্রস্থান করিলে নলিনী সরোজিনীকে সম্মুখে বসাইয়া পড়া বলিয়া দিতে আরম্ভ করিল। একবার যাহা বলিয়া দেয়, সরোজ তৎক্ষণাৎ তাহাই অভ্যাস করিয়া ফেলে। সরোজিনীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তীক্ষ্ণমেধা দেখিয়া—সরোজের মুখে মধুমাখা—হাসিমাখা সুধাকথা শুনিয়া—নলিনীর মন যেন বিমুগ্ধ হইয়া উঠিল। নলিনীর অমিয়মূর্ত্তি দর্শনে—নলিনীর প্রশান্তমূর্ত্তি দর্শনে—নলিনীর মধুময়ী বাণী শ্রবণে—সরোজিনীর হৃদয়েও যেন অভূতপূর্ব্ব আনন্দ জন্মিল। আহা! বালকবালিকা! বালকের হৃদয়ে—বালিকার হৃদয়ে বাল্যপ্রেম, বাল্য ভালবাসা যে কি মধুর, তাহা যাঁহার বুঝিবার ক্ষমতা আছে, তিনিই বুঝিতে পারেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবভাব।

সময় কাহারও হাতধরা নহে। দিনের পর দিন, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, ক্রমে আবার বৎসর ঘুরিয়া আসিল।—আবার শারদীয়া পূজা সমাগত। রাধানাথ বাবুর বাড়ীতে পূজায় মহাধুম, সুতরাং তিনি সকলের অগ্রেই বাটীতে গমন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে চতুর্থী সমাগত। কলিকাতার আফিস, স্কুল সমস্ত নির্দ্দিষ্ট দিনের জন্য বন্ধ হইল। বিদেশীয় ব্যক্তিরা আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় পূর্ব্বক স্বদেশ-গমনে উদ্যত হইলেন। পঞ্চমীর দিন প্রভাতে সুরেন্দ্রবাবু স্বগণে স্বদেশে গমন করিবেন। সরোজিনীর আনন্দের পরিসীমা নাই।

নলিনী কলেজের ছুটি হইলে, বরাবর সুরেন্দ্র বাবুর সহিত তাঁহাদিগেরই বাটীতে আসিয়াছে। এখন নলিনী প্রায় সর্ব্বদাই সুরেন্দ্রের নিকট থাকে, রাত্রিতেও সকল দিন নিজগৃহে যায় না। তবে জননীর অঞ্চলের নিধি, নলিনীর মুখ দেখিয়াই বসন্ত-লতা দুঃখজীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, পাছে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হয়, এই জন্য মধ্যে

মধ্যে এক একদিন বাড়ীতে রাত্রিযাপন করে। সুরেন্দ্র-নাথ কথোপকথন করিতে করিতে নলিনীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই নলিন! তুমি কি ছুটিতে বাড়ী যাবে?"

নলিনী এখন সুরেন্দ্রনাথকে দাদা সম্বোধন করে। সুরেন্দ্রের এই প্রশ্ন শুনিয়া তাহার অন্তরে একটু বেদনা বোধ হইল। ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিল, "দাদা! আমাদের আর বাড়ী কোথায়, যে বাটী যাইব? তবে যদি আপনি সঙ্গে কোরে বর্দ্ধমানে লয়ে যান, যেতে প্রস্তুত আছি।"

নলিনীর এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "তবে ভাই তুমি কিঞ্চিৎ কাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার জননীর মত লয়ে আসি। তাহার অমতে কোন কাজ করা ভাল নয়।" এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ বসন্ত-লতার নিকট গিয়া সমস্ত নিবেদন করিলে, তিনি প্রথমতঃ ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া তৎপরে সম্মতি প্রদান করিলেন।

সরোজিনী নলিনীকে "ছোটদাদা" বলিয়া সম্বোধন করে। এখন আর সুরেন্দ্রনাথকে সরোজের পড়া বলিয়া দিতে হয় না। নলিনী পড়া বলিয়া না দিলে, এখন আর সরোজিনীর আর কাহারও নিকট পড়িতে ইচ্ছা হয় না। নলিনীর নিকট থাকিতে—নলিনীকে দেখিতে—নলিনীর কথা শুনিতেই এখন তাহার একমাত্র ইচ্ছা। এখন আর সে পূর্ব্বের মত নিতান্ত বালিকা নহে, যৌবনের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। এখন সরোজের দেহে—সরোজের হৃদয়ে যেন নব নব ভাবের উদয় হয়।

পঞ্চমীর দিন সুরেন্দ্রবাবু, নলিনী, সরোজিনী এবং অন্যান্য সকলেই বর্দ্ধমানের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আনন্দ-কোলাহলে বাটী আনন্দময়! মহামায়ার আগমন, নানারূপ বাদ্যবাদনে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত। আনন্দের রোলে সকলেই মাতিয়া উঠিল!

দেখিতে দেখিতে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা শেষ হইল। হরিষে-বিষাদে বিজয়ার দিবস এক বৎসরের জন্য জগন্ময়ীকে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল। সম্বৎসরের আনন্দের দিন আবার ফুরাইয়া গেল?

একদিন সুরেন্দ্রবাবু ও নলিনী বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে সরোজিনী ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিবামাত্র হাসিতে হাসিতে কহিলেন, “সরোজ! তুমি দিদি আজি কালি বড় দুষ্ট হয়েছ। আর তোমাকে একদিনও পড়্‌তে দেখি নি। কেবল খেলা কোরে বেড়াও।”

পদ্মমুখখানি যেন একটু ম্লান হইয়া গেল। মধুমাখা কথায় মলিনবদনে সরোজিনী বলিয়া উঠিল, “না দাদা! আমি ত রোজই পড়ি। ছোটদাদাকে জিজ্ঞাসা কর না। এই ত পড়্‌বো বোলে বই এনেছি।”

সহোদরার মলিনমুখ দেখিয়া সুরেন্দ্রের প্রাণে আঘাত লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সহাস্যবদনে আদর করিয়া কহিলেন, “বেশ দিদি বেশ! কৈ,—কি বই দেখি? কোন্ খানটা পড়্‌ছো?”

সরোজিনীর হস্ত হইতে পুস্তকখানি লইয়া সুরেন্দ্রবাবু দেখিলেন, “পদ্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগ।” অমনি দুই চারি-

খানি পাতা উল্টাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ খানটা পোড়্ছো ?"

"রামের বনগমন পড়া হয়ে গেছে।"

উত্তর শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং রামের বনগমন বাহির করিয়া সেইস্থানটী পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

সরোজিনীর সে পাঠ ভাল লাগিল না;—কহিল, "দাদা! তুমি অত তাড়াতাড়ি পড় কেন? ও ভাল শোনায় না। ছোটদাদা কেমন আস্তে আস্তে পড়ে, তাৎত বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।"

ভগ্নীর এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ নলিনের হস্তে পুস্তকখানি প্রদান করিলেন। নলিনী পুস্তকখানি লইয়াই সরোজিনীর হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিল, "সরোজ! তুমি পড় ত, আমরা শুনি।"

সরোজিনী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সহাস্যবদনে দুই চারিখানি পাতা উল্টাইয়া একটী স্থান পড়িতে আরম্ভ করিল:—

জানকী কহেন দুঃখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস॥
তুমি যে পরমগুরু তুমি যে দেবতা।
তুমি যাও যথা নাথ আমি যাই তথা॥
স্বামীবিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি॥
প্রাণনাথ! একা কেন হবে বনবাসী?
পথের দোসর হব সঙ্গে লও দাসী॥
বনে বনে ভ্রমণ করিবে নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাশরিবে, যদি দাসী থাকে পাশে॥

যদি বল সীতে, বনে পাবে নানা দুঃখ।
শত দুঃখ ঘুচে যদি হেরি তব মুখ॥
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুঃখ সুখ হেন মানি॥

পাঠ সমাপ্ত হইলে, সুরেন্দ্রবাবু যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরোজ! যা পোড়্‌লে, বেশ বুঝ্‌তে পেরেছ?"

"হ্যাঁ দাদা! আমি বেশ বুঝেছি।"—তৎক্ষণাৎ মধু-মাখাস্বরে সরোজিনী উত্তর করিল, "হ্যাঁ দাদা! আমি বেশ বুঝেছি।"

পাঠক মহাশয়েরা মনে করিতে পারেন যে, এটী গ্রন্থকারের কৌশল। গ্রন্থকার কৌশল করিয়া পদ্যপাঠের ঐ স্থানটীর উল্লেখ করিলেন, কিন্তু তাহা নহে, স্ত্রীলোকের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবই এই যে, যে স্থানে কাহারও নিন্দা অথবা নারীজাতির প্রশংসা থাকে, কিম্বা যেখানটী পড়িতে বেশ শ্রুতিমধুর, অতি কষ্টকর হইলেও সেইস্থানটী অগ্রে অভ্যাস করে। সে স্বভাব ত আর গ্রন্থকার শিখাইয়া দেন নাই।

সরোজিনী যখন প্রথম ঐ স্থানটী পাঠ করিতে আরম্ভ করে, তখন একবার সুরেন্দ্রবাবুর দিকে এবং একবার বা নলিনীর দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছিল। তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছিল যেন, তাহার মন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে পাঠ সমাপ্ত করিয়া, অধোবদনে বসিয়া রহিল। তখন তাহার মুখপদ্ম যেন ঈষৎ রক্তিমা ধারণ করিল।—যেন তাহার অন্তরে একরূপ নবভাবের উদয় হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ একমনে সরোজিনীর পাঠ শুনিতেছিলেন, অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তদ্দর্শনে নলিনীও গাত্রোত্থান করিল। সুরেন্দ্রনাথ নলিনীকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, "আমি শীঘ্রই আসিতেছি, তুমি ততক্ষণ সরোজকে পড়া বোলে দেও!"

সরোজিনী এ যাবৎ অধোমুখে বসিয়াছিল। নলিনী তাহাকে দুই চারিটী শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলে, সে আবার মুখ তুলিয়া কথা কহিতে প্রবৃত্ত হইল। নলিনীর সাক্ষাতে সুরেন্দ্রবাবু থাকিলে এখন আর সরোজিনী মুখ তুলিয়া কথা কহে না, যাহা কিছু বলিবার আবশ্যক হয়, অধোমুখী হইয়াই প্রকাশ করে।

নলিনী কি জাতি, বাটী কোথায়, কাহার সন্তান, সরোজিনী এখনও তাহার কিছুই অবগত নহে। পড়া বলিতে বলিতে আজি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "আচ্ছা, ছোটদাদা! তুমি আমাদের কে?"

হঠাৎ এই প্রশ্ন শুনিয়া, নলিনীর হৃদয় যেন চমকিয়া উঠিল। তখন তাঁহার মনের গতি যে কি ভাব ধরিল, তাহা গ্রন্থকারও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। নলিনী, প্রশ্ন শুনিয়াই হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল, "আপনার সে কথায় কাজ কি? আপনি এখন পড়ুন।"

বিদ্রূপ শুনিয়া প্রথমতঃ সরোজিনীর বিম্বাধারে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখা দিল। পরক্ষণেই বলিল, "আজি আবার নূতন কথা দেখ্‌ছি যে। আমি দাদাকে বোলে দিব।"

সরোজিনীর কথা শুনিবামাত্র নলিনীর নাসারন্ধ্র হইতে একটী দীর্ঘনিশ্বাস বিনির্গত হইল। তদ্দর্শনে সরোজিনী

বুঝিতে পারিল যে, নলিনীর অন্তরে ব্যথা লাগিয়াছে। অমনি ব্যস্তসমস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "ছোটদাদা! এত জোরে নিশ্বাস ফেল্লে কেন বল, তা না হলে আমি দাদাকে সব কথা বোলে দিব।"

নলিনী নিরুপায় হইয়া আত্মভাব গোপন করতঃ কহিল, "আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে। আমি কালিই কলিকাতায় জননীর নিকটে যাব।"

সরোজিনী সে কথায় ততদূর কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "ছোটদাদা! তুমি আমাদের কে, বোল্‌তেই হবে।"

নলিনী সরোজিনীর নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া কহিল, "সরোজ! আমি তোমাদের কেহই নহি, স্বজাতিমাত্র। আমি নিতান্ত গরিব। তোমার দাদার সঙ্গে বাটীতে—"

বলিতে বলিতে নলিনীর কণ্ঠরোধ হইল। আপনার অবস্থা স্মৃতিপটে সমুদিত হওয়াতে অশ্রুবারি একত্র হইয়া নয়নযুগল ভাসমান করিল, আর কথা কহিতে পারিল না।

আর কি কোমলাঙ্গীর কোমল প্রাণে সে যাতনা সহ্য হয়? নলিনীর চক্ষে জল দেখিয়া, সরোজিনীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি স্বীয় অঞ্চল দ্বারা নলিনীর নয়নাশ্রু মার্জ্জন করিয়া কহিল, "কেন ছোটদাদা কাঁদ্‌ছো? তুমি নিশ্চয়ই আমাদের কেহ না কেহ হবে।—নৈলে তোমাকে দেখ্‌বার জন্য আমার মন এত উচাটন হয় কেন? আমার মন কেবল তোমাকেই ভালবাস্‌তে চায়, নয়ন কেবল তোমার রূপ দেখ্‌লেই সন্তুষ্ট হয়। নিশ্চয়ই তুমি আমাদের আপনার কেহ হবে।"

সরোজিনীর এই কথা শুনিয়া নলিনীর হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া

বলিয়া উঠিল, "সরোজ! আমিও তোমার দাদাকে এই সব কথা বোলে দিব।"

সরোজের হৃদয়ে ভয়-সঞ্চার হইল। সে তাড়াতাড়ি নলিনীর হাত দুখানি ধরিয়া বলিল, "ছোটদাদা! আমি তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেম। তুমি কি তার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা কর?"

"তবে তুমি প্রতিজ্ঞা কর, তোমার দাদার কাছে কোন কথা বোল্‌বে না?"

"নলিনীর এই কথা শুনিয়া সরোজিনী উত্তর করিল, "না, বোল্‌বো না। তুমিও আমার কথা বোল্‌বে না, স্বীকার কর?"

নলিনী বলিল, "না, আমি আর কোন কথা তাঁকে বোল্‌বো না। সে কথা যাক্, সরোজ! এখন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে, তুমি কি আমাদের সঙ্গে আবার কলিকাতায় যাবে?"

"তা আর বোল্‌তে? আমি তোমাকে না দেখ্‌লে কোনমতে থাকৃতে পার্‌বো না।"

"তোমার দাদা যদি সঙ্গে কোরে না নিয়ে যান?"

অমনি সরোজিনী বলিয়া উঠিল, "নিতেই হবে। আমাকে না নিয়ে গেলে আমি কাঁদ্‌বো।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, অকস্মাৎ সুরেন্দ্রনাথ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সরোজিনী অধোমুখে তথা হইতে প্রস্থান করিল। সুরেন্দ্রনাথ এতক্ষণ পার্শ্ববর্তী গৃহে থাকিয়া, গোপনে নলিনী ও সরোজিনীর কথোপকথন শুনিতেছিলেন। পরস্পরের অনুরাগ দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তিনি

মনে মনে স্থির করিলেন যে, নলিনীর হস্তে সরোজিনীকে সম্প্রদান করিলেই নবদম্পতী চিরসুখে থাকিবে, সন্দেহ নাই। তিনি পূর্ব্ব হইতেই সংকল্প করিয়াছিলেন, এবং পিতার নিকটেও বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে নলিনীর মনোভাব অবগত হইয়া, তৎপরে বসন্ত-লতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবেন; কিন্তু এ যাবৎ তাঁহার সে সংকল্প সিদ্ধ হয় নাই। আজি পূর্ণমনোরথ হইয়া, আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পিতার নিকটে গিয়া গোপনে এই সমস্ত সংবাদ প্রদান করিলে, রাধানাথ বাবু কহিলেন, "বাবা সুরেন্দ্র! আজি আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম। আগামী কল্য তুমি নলিনীকে লইয়া, কলিকাতার বাটীতে গমন কর। পরশ্ব তোমার কলেজ খুলিবে। আমি কতিপয় দিন পরেই কলিকাতা গিয়া যাহা বিহিত হয়, তাহা করিব।"

সে দিন অতিবাহিত হইল। প্রভাতে সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতা যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমস্ত স্থিরীকৃত হইলে, দুইখানি শিবিকা উপস্থিত হইল। ষ্টেশন পর্য্যন্ত শিবিকাতে গমনাগমন করাই তাঁহাদিগের প্রথা আছে। একখানিতে সুরেন্দ্রনাথ ও অপরখানিতে নলিনী গমন করিবেন। শিবিকা দর্শনমাত্র সরোজিনী সুরেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "দাদা! আমি তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাব।" সুরেন্দ্রনাথ অসম্মতি প্রকাশ করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকট গিয়া কহিল, "বাবা! আমাকে কলিকাতায় দাদার সঙ্গে পাঠাইয়া দেও।"

রাধানাথ বাবু বলিলেন, "ছি মা! এখন কি যেতে আছে? তুমি রাসের সময় আমার সঙ্গে যাবে?"

সরোজিনী প্রবোধ মানিল না। সে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তখন নলিনী সুরেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দাদা! আমি গরিব, আমার শিবিকা-রোহণে যাওয়া ভাল দেখায় না। আমি পদব্রজেই ষ্টেশনে যাব। আপনি বরং এক কাজ করুন, সরোজিনী আবদার কোচ্চে, ওকে বরং একখানি পাল্কীতে কোরে নিয়ে যান, আর একখানিতে আপনি আরোহণ করুন।"

সুরেন্দ্রনাথ স্পষ্টই বুঝিলেন যে, উভয়ের অনুরাগ ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে। এ অবস্থায় সরোজিনীকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া যাওয়া অনুচিত। সুতরাং পিতাকে বলিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে আর একখানি শিবিকা আনয়ন করাইলেন। অনন্তর সুরেন্দ্র, নলিনী, সরোজিনী তিনজন তিনখানি শিবিকাতে আরোহণ পূর্ব্বক কলিকাতা উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।
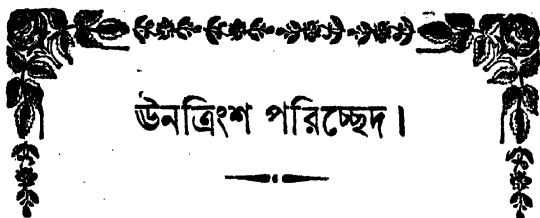
উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হারানিধি লাভ।

বেলা চারিটা। কলিকাতা পটলডাঙ্গার রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য বালক,—অসংখ্য গাড়ি। ছুটির পর বালকেরা কেহ গাড়িতে, কেহ পাল্কীতে, কেহ বা পদব্রজে গমন করিতেছে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভ, অল্প অল্প শীত, রৌদ্রের উত্তাপ তাদৃশ প্রখর নহে; সুতরাং এখন আর সকলে প্রায় ছত্র ব্যবহার করেন না। দুইটী বালক কথোপকথন করিতে করিতে ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে।

কিয়দ্দূর গমন করিলে হেদুয়া দীঘি সম্মুখবর্ত্তী হইল। তখন বালকদ্বয় পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণার্থ উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণের পর শ্রান্তিবোধ হওয়াতে উভয়ে একটী সোপানোপরি উপবেশন করিল। সোপানটী বিলক্ষণ বিস্তৃত, তাহারই একপ্রান্তে একটী দরিদ্রবেশী পথিক জীর্ণ ও মলিনবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

পাঠক মহাশয়েরা কি বালক দুইটীকে চিনিতে পারিয়াছেন? উহারা অপর কেহই নহে, সুরেন্দ্রনাথ ও নলিনী।

নলিনী সুরেন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দাদা! আজি আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিছুতেই শান্তিবোধ হচ্চে না। যেন বহুদিনের হৃতধন লাভ কর্‌বার জন্য আমার চিত্ত উদ্বিগ্ন! আমি এ ভাবের কারণ কিছুই স্থির কোত্তে পাচ্চি না।"

নলিনীর কাতরতা দেখিয়া প্রবোধ বচনে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "ভাই! সময়ে সময়ে মন চঞ্চল হয়, তার জন্য উদ্বিগ্ন হইও না। বিশেষ অনেকদিন বর্দ্ধমানে ছিলে, একস্থান হতে অন্যস্থানে কিছুদিন পরে গেলে, হঠাৎ মন বিচলিত হয়ে পড়ে। যা হোক, ধৈর্য্য অবলম্বন কোরে থাক!"

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, সহসা পার্শ্বস্থ পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পার্শ্বে দুইটী সম্ভ্রান্ত যুবাকে দেখিয়া কুণ্ঠিতভাবে একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। নলিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র নলিনীর চক্ষুও তাঁহার নেত্রোপরি নিপতিত হইল। উভয়েরই হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, উভয়েরই নয়নে নয়ন মিশিয়া গেল, উভয়ের চিত্তই চঞ্চল? নলিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এই ভিখারী পথিককে দেখিয়া সহসা আমার মনোমধ্যে এক প্রকার অভিনব ভাবের আবির্ভাবের কারণ কি? আবার ভাবিল, না, ইহাকে দেখিয়া মনের চাঞ্চল্য জন্মিতে পারে না। পূর্ব্ব হইতেই আমার মন কেমন উদ্বিগ্ন হইয়াছে, সেই জন্যই এত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

পথিক একদৃষ্টে নলিনীর মুখচন্দ্র দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "এ কি? সহসা আমার হৃদয় স্নেহ-

রসে অভিষিক্ত হইল কেন? জগতে আমার এমন কে আছে যে, তাহার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিবে?—আছে, একমাত্র বসন্ত-লতা।——আর আছে, যদি সেই অভাগিনীর উদরে কোন শিশুর জন্ম হইয়া থাকে। তবে এই বালককে দেখিয়া, আমার চিত্ত-বিকৃতি হইবার কারণ কি?—কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। হইতে পারে, চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া, বনে জঙ্গলে পশুপক্ষীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়াছি। লোকালয় দেখি নাই, লোকের মুখদর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই। আজি লোকালয়ে আসিয়াছি, লোকের মুখ দেখিলে সহজেই আনন্দ জন্মিতে পারে। বিশেষ যাহা নয়নের প্রীতিকর, তাহা দেখিলে কাহার হৃদয় প্রফুল্ল না হয়? এই বালকের মোহনরূপেই আমার হৃদয় ভুলিয়া গিয়াছে।”

পাঠক মহাশয়! এখন কি এই পথিককে চিনিতে পারিয়াছেন? ইনিই সেই বসন্ত-লতার আরাধ্য ধন প্রাণ-পতি নীরদচরণ। ইনিই দুঃখিনী-ধন নলিনীর জন্মদাতা পিতা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নীরদবাবু হেদুয়া দীঘিতে আসিয়া নানাপ্রকার চিন্তা করতঃ বিশ্রামার্থ শিলাতলে উপবেশন করেন। পরে চিন্তা করিতে করিতে সেইস্থানেই নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

নীরদবাবু ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া সুরেন্দ্রবাবুকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয় এটী কোন্ স্থান?”

সুরেন্দ্রের হৃদয় সহজেই দয়াপূর্ণ, তাহাতে পথিকের বিনয়নম্র মধুর বাক্য শ্রবণে, তাহার দুরবস্থা দর্শনে যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি-

লেন, এ ব্যক্তি সম্ভ্রান্তবংশীয়। কোনরূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া হীনবেশ ধারণ করিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন শ্রবণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "মহাশয়! এটী কলিকাতা সহর, এ স্থানের নাম সিমলা, এটী হেদুয়া দীঘি।"

নীরদবাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! মালা-পাড়া এখান হইতে কতদূর?"

এই কথা শুনিবামাত্র সুরেন্দ্রের হৃদয় চমকিত হইয়া উঠিল। তিনি নলিনীর মাতার নিকট পূর্ব্বেই নীরদবাবুর নিরুদ্দেশের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিলেন, হয় ত সেই নীরদবাবুই হইতে পারে। হয় ত এতদিনের নলিনীর অদৃষ্টচক্র ফিরিতে পারে। আবার ভাবিলেন, না, সেরূপ অদৃষ্ট নলিনীর নহে। চতুর্দ্দশবর্ষ যাঁহার কিছুমাত্র সন্ধান নাই, তিনি যে আর স্বদেশে ফিরিয়া আসেন, আর যে বসন্ত-লতার তাদৃশ সুখসূর্য্য সমুদিত হয়, তাহা নিতান্ত অসম্ভব। তিনি মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! মালাপাড়া অধিক-দূর নহে। আমরা সেইস্থানেই বাস করি। সেথানে কি আপনার কেহ আত্মীয় আছেন?"

সহসা পরিচয় দিতে নীরদের ইচ্ছা হইল না। যদি ইঁহারা নরেন্দ্র বাবুর প্রতিবাসী হন, যদি নরেন্দ্র বাবুর সহিত ইঁহাদের আলাপ থাকে, আমার এই অবস্থা দেখিয়া আমি তাঁহাদের আত্মীয় জানিলে, মনে মনে ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে, এই ভাবিয়া সমস্ত গোপন করিয়া কহিলেন, "না, তেমন আত্মীয় কেহই নাই, তবে পরিচিত দুই একটী লোক ছিল, অনেকদিন আসি নাই, তাহারা আছে কি

না, তাহাই বা কিরূপে জানিব? আমি বিদেশী, একটু আশ্রয় পাইলে, দুই একদিনের জন্য থাকিয়া তাঁহাদের অন্বেষণ করি।”

তৎক্ষণাৎ পবিত্রমনা সুরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, “আচ্ছা, আপনার চিন্তা নাই। আপনাকে দেখিয়া, সম্ভ্রান্ত বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি যে কয়েক-দিন ইচ্ছা, নিজ বাটী জ্ঞানে আমাদের নিকট থাকিতে পারেন।”

কৃতজ্ঞতা জানাইয়া—ধন্যবাদ দিয়া, নীরদবাবু ভূয়োভূয়ঃ সুরেন্দ্রনাথের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ও নলিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, তৎক্ষণাৎ বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সে দিন নলিনীর মনটা উদ্বিগ্ন হওয়াতে জননীর নিকট প্রস্থান করিল।

সুরেন্দ্রবাবু বিশেষ যত্ন ও আদরের সহিত পথিককে আহার করাইয়া, দিব্য নূতন বস্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর রাত্রি ৮টার সময় নির্জ্জনে বসিয়া কথোপকথনচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! যদি বিরক্ত না হন, যদি বাধা না থাকে, পরিচয় দিলে পরম সুখী হই।”

নীরদবাবু ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, “মহাশয়! আপনার অন্তর যেরূপ সরল, আপনার হৃদয় যেরূপ পবিত্র, আপনি আমার যেরূপ হিতৈষী, তাহাতে আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমি আপনার নিকট সত্য পরিচয় দিব। আমার দুঃখ-কাহিনী শুনিলে আপনার কৌতূহল পূর্ণ হইবে না, অধিকন্তু মর্ম্মে মর্ম্মে বেদনা পাইবেন।”

নীরদবাবু এই বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক এই চতুর্দ্দশবর্ষের যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করিলেন। তখন সুরেন্দ্রের হৃদয় যেন পলকে পলকে নাচিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি আর চিন্তা করিবেন না। আমি যে সন্দেহ করিয়া হেদুয়া দীঘি হইতে আপনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসি, সেই সন্দেহ এখন আমার আনন্দের একমাত্র কারণ হইয়া উঠিল। আপনার সহধর্ম্মিণী আমার জননীস্বরূপ, তিনি আপনার আশাপথ চাহিয়া আজিও জীবনধারণ করিতেছেন। অভাগিনী ভাগ্যফলে একটী সুশীল সুপুত্রলাভ করিয়াছেন; আপনি তাহাকেও দেখিয়াছেন। হেদুয়া দীঘিতে আমার বামপার্শ্বে যে বিশ্বমোহন রূপের আধার বসিয়াছিল, সেই-ই আপনার ঔরসজাত সুকুমার। আমি তাহাকে সহোদর অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করি। তাহার নাম নলিনী। জগতে নলিনীর তুল্য প্রিয় সুহৃদ্ আমার আর কেহই নাই।"

নীরদের প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল, দর দর ধারে অশ্রু-ধারা পড়িতে লাগিল।—কহিলেন, "হায়! আমি সম্মুখে পাইয়াও অঙ্কনিধিকে চিনিতে পারিলাম না? আমার জীবনে ধিক্! যখন আমি সেই মোহনমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়া-ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে কিছুই চিনিতে পারিলাম না। প্রত্যক্ষ দেখিয়াও তাহার মুখচুম্বন এ হতভাগ্যের অদৃষ্টে ঘটিল না!"

সুরেন্দ্রনাথ নীরদ বাবুকে একান্ত কাতর দেখিয়া,

নানাবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনার সুখসূর্য্য সমুদিত, এতদিনে আপনি দুঃখতামসীর করাল হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, আর অধীর হইবেন না, প্রভাতেই পুত্রকলত্র দর্শন করিয়া পরমসুখী হইবেন।"

সুরেন্দ্র বাবু এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিলে নীরদ-চরণ কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া, শয়নার্থ নির্দ্দিষ্ট শয্যায় গমন করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ স্বীয়কক্ষে উপনীত হইলেন।
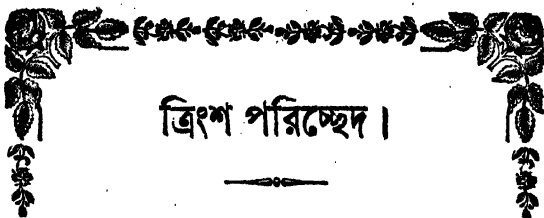
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মিলন!

এখন নলিনী নবযুবা, নলিনীর জ্ঞান জন্মিয়াছে। সে দেখিল যে, জগতে জননী ভিন্ন আর তেমন আত্মীয় কেহ নাই। বিশেষ জননীকে যত্ন করে, এবং তাহাকেও যত্ন করে, এমন লোক অতি বিরল। কেবল হীরার মা প্রাণ অপেক্ষাও নলিনীকে অধিক স্নেহ করে। যদি তাহাকে মিষ্টকথায় সন্তুষ্ট রাখা যায়, তাহা হইলে সে চিরবাধ্য হইয়া নিকটে থাকিবে। এই বিবেচনায় নলিনী হীরার মাকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করে। সেই সম্পর্কে সুরেন্দ্র বাবুও মাসী বলিয়া থাকেন। ফলকথা, এইরূপ সম্বোধনে হীরার মা যার পর নাই তুষ্ট ও বাধ্য হইয়া রহিয়াছে। এতদিন বামুন দিদি ছিল, এখন আর সে নাই। সেরূপ স্বভাবের লোক কতদিন এরূপে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে? সে নরেন্দ্র বাবুর নিকট ও বসন্ত-লতার নিকট বিদায় লইয়া, নিজগৃহে প্রস্থান করিয়াছে। কলিকাতায় একমাত্র পদ্মলোচনের সহিত তাহার কিছু ভালবাসা জন্মিয়াছিল, বিধাতা সে ভালবাসাও ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। পাঠক মহাশয়েরা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন যে, চৌর্য্য-

অপরাধে পদ্মলোচন ধৃত হয়। নরেন্দ্রবাবু দুষ্টের শাসন ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞানে, তাহার পরিত্রাণার্থ ততদূর যত্ন বা প্রয়াস পান নাই; সুতরাং ছয় মাসের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত পদ্মলোচনের কারাবাস হয়, অভাগা কিয়দ্দিন মধ্যে কারাগারেই দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছে। এদিকে নরেন্দ্র বাবুর বৃদ্ধ পিতা মাতাও একদিনে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এই সকল কারণে নরেন্দ্র বাবুর মনও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু চিন্তিত ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি নীরদ বাবুর অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হন নাই। সাধ্যমত যত্নে অন্বেষণ করিতেছেন।

রাত্রিকালে নানা চিন্তায় নিমগ্ন থাকাতে সুরেন্দ্রনাথের নিদ্রাকর্ষণ হইল না। তিনি ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ত্বরিতপদে নলিনীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তখন নলিনী ও তাহার জননী উভয়েই নিদ্রিত। হীরার মা উঠিয়া গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে। সুরেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি গিয়া হীরার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাসী! মা কোথায়?"

"বৌদিদি এখনও ঘুমুচ্ছেন। আহা! দিদির কি আমার নিদ্রা আছে? চিন্তায় চিন্তায় দিবানিশি অতীত হয়। আজি হঠাৎ একটু ঘুম হয়েছে। ডাক্‌বো কি?"

হীরার মার কথা শুনিয়া, সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, ডাক্‌তে হবে না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। নীরদবাবু যে নিরুদ্দেশ হয়েছেন, তা কি তোমার মনে পড়ে?"

"সে কি বাবা! তা আর মনে পোড়্‌বে না? সে ত সে দিনের কথা;—চৌদ্দবছর বৈ ত নয়। আহা! বৌদিদি কেবল দুঃখ ভোগ কোত্তেই পৃথিবীতে এসেছিল।"

হীরার মাকে বাধা দিয়া সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন; "আচ্ছা মাসী! তুমি তাঁকে দেখ্‌লে চিন্তে পার?"

"আ কপাল! তা আর পার্‌বো না? আমি যেন চকের উপর দেখ্‌ছি! সেই নাক—সেই মুখ—সেই চোক, সেই টানা ভ্রূ যেন আমার চকের সাম্‌নে রয়েছে।"

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আচ্ছা মাসী! তুমি এক কাজ কর; একবার শীঘ্র আমার সঙ্গে এসো। আমাদের বাড়ী থেকে এসে শেষে গৃহকাজ শেষ কোর্‌বে। ততক্ষণ মা ও নলিনী উঠুক।"

"আচ্ছা বাবা!" বলিয়া হীরার মা তৎক্ষণাৎ সুরেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হইল। যেমন তাঁহাদের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি তাহার হৃদয় চমকিয়া উঠিল। নীরদবাবু বাহিরের ঘরেই বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র চমকিত হইয়া "দাদাবাবু দাদাবাবু!" বলিয়া চীৎকারস্বরে কাঁদিতে লাগিল।—নীরদের পদতলে পড়িয়া ভেউ ভেউ করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

তখন তাহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া, নীরদবাবু বসন্ত-লতার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রিয়তম পুত্রের বদন দর্শনার্থ তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। এখন আর সুরেন্দ্রনাথের অন্তরে কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি হীরার মাকে নলিনীর বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন, তাহার সহিত একখানি ভাড়াটিয়া শকট লইয়া একটী ভৃত্যও গমন করিল। বসন্ত-লতা ও নলিনী সেই গাড়ীতেই আসিবেন। সুরেন্দ্র বাবু হীরার মাকে নিষেধ করিয়া দিলেন, সহসা যেন নীরদ বাবুর আগমন বসন্ত-লতার কর্ণগোচর না হয়। হঠাৎ পূর্ণানন্দ জন্মিলে অত্যাহিত

ঘটিবার সম্ভব, সুতরাং কলে-কৌশলে তাঁহাকে আনয়ন করিতে হইবে।

এদিকে বসন্ত-লতা শয্যাত্যাগ করিয়া, হীরার মার অদর্শনে যার পর নাই চিন্তিত হইয়াছেন। নলিনীও গাত্রোত্থান করিয়াছে। ইত্যবসরে হীরার মা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বসন্ত-লতা কতকগুলি মিষ্ট ভৎর্সনা করিলেন। তখন হীরার মা হাসিতে হাসিতে কহিল, "বৌদিদি! সুরেন বাবুদের বাড়ীতে বড় তামাসা হচ্চে, তাই গিয়েছিলেম। তোমাকে আর নলিনীকে লয়ে যাবার জন্য এই গাড়ি এয়েছে;——চল, তামাসা দেখ্‌তে চল!"

বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধস্বরে বসন্ত-লতা কহিলেন, "তোর বুড়ো বয়সে আমোদ ভাল লেগেছে, তুই তামাসা দেখ্। আমি আপনার অন্তরের জ্বালায় মরি, আমার ও সব কথা ভাল লাগে না, আমি তামাসা দেখ্‌তে চাই না।"

বসন্ত-লতা এইরূপ বলিলেও হীরার মা ছাড়িল না, নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অগত্যা বসন্ত-লতাকে সম্মত হইতে হইল;—নলিনীকে লইয়া শকটারোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে পরিহাস করিয়া হীরার মা বলিল, "বৌদিদি! যে লোকটা তামাসা দেখাচ্ছে, ঠিক্ আমার দাদাবাবুর মত।"

বিরক্ত হইয়া বসন্ত-লতা কহিলেন, "পোড়ার মুখ! আমার অন্তরে আঘাত দিলে কি তুমি সুখী হও? যে কথা শুন্‌লে আমার হৃদয়াগুণ বেড়ে উঠে, তা না কল্লে কি তোমার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না? যদি আমার

তেমন ভাগ্য হবে, তা হোলে আর তুই অমন কথা বল্‌বি কেন?"

হীরার মা একটু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল,—"না বৌদিদি! রাগ করো না, যদি একটা না বুঝে বোলে থাকি,—বুড়ো হয়েছি, মনের ঠিক নেই, কি বোল্‌তে কি বলি, যদি একটা কথা না বুঝে বোলে থাকি, ক্ষমা করো।"

বলিতে বলিতে গাড়ি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। সকলেই গাড়ি হইতে অবতরণ করিলেন। বসন্ত-লতার হস্তধারণ পূর্ব্বক হীরার মা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, নলিনী জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যে গৃহে নীরদবাবু ও সুরেন্দ্রনাথ বসিয়া আছেন, হীরার মা সেই গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া বসন্ত-লতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "বৌদিদি! তামাসা দেখ্‌তে এয়েছ, ঐ চেয়ে দেখ দেখি, কে বোসে রয়েছে!"

হীরার মার এই কথা শুনিবামাত্র বসন্ত-লতা যেমন দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, অমনি তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল! সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল!——ঘন ঘন স্বেদোদ্গম হইতে লাগিল। তিনি গদ্গদস্বরে "হা প্রাণনাথ" বলিয়া অমনি ধরাতলে মূর্চ্ছিত হইলেন।

আর নীরদচরণের চিত্ত ধৈর্য্য মানিল না, তিনি প্রেম-ভরে দুই বাহু প্রসারিয়া প্রিয়তমার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। সরোজিনী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি জল আনিয়া বসন্ত-লতার চক্ষে-মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিল। এদিকে নলিনীর হৃদয় আনন্দরসে পরিপূর্ণ হইল। যাঁহার ঔরসে বিশ্বপাতার অসীম বিশ্বমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি একদিনের

জন্যও যাঁহার দর্শন পায় নাই, আজি সেই পরমারাধ্য পিতৃদেবের চরণ দর্শন হইল, ইহা অপেক্ষা পুণ্যের—সুখের—আনন্দের বিষয় আর কি আছে? নলিনী করযোড়ে পিতৃপদে প্রণত হইলে, নীরদচরণ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নবারিতে নলিনীর মস্তক অভিষিক্ত হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই বসন্ত-লতা চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া পতির বক্ষে প্রিয়পুত্রকে দেখিয়া, আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসরের যাবতীয় দুঃখ—শোক তাঁহার হৃদয় হইতে এতদিনে অপসারিত হইল।

আজি শুভমিলন, আনন্দের দিন! সকলে আহারাদি করিয়া অন্তঃপুরে একত্র উপবেশন করিলেন। নরেন্দ্র-বাবু ও শশীমুখী এই শুভসংবাদ পাইয়া, প্রেমপুলকিত চিত্তে সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। আজি আর সুরেন্দ্র ও নলিনী কলেজে গমন করিলেন না। আহারান্তে সকলে একত্র উপবিষ্ট হইলে, সকলের অনু-রোধে নীরদচরণ আপনার যাবতীয় ঘটনা অকপটে প্রকাশ করিলেন। ডাক্তারকে ডাকিতে গিয়া যেরূপে নদীগর্ভে নিপতিত হন, যেরূপে ভাসিতে ভাসিতে কাষ্ঠ-ফলক অবলম্বনে সাগরের অদূরে গিয়া অচৈতন্যাবস্থায় বৃক্ষশাখায় লগ্ন হন, যেরূপে সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া, চতুর্দ্দশবর্ষ তাঁহার আদেশে সেই নিবিড় বনভাগে অবস্থিতি করেন, যেরূপে বনদেবীর কৃপায় কলিকাতায় উপস্থিত হন, যে প্রকারে সুরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার সাহায্যে প্রিয়তমা ও পুত্রের দর্শনলাভ করি-লেন, তৎসমস্তই সর্ব্বসমক্ষে অকপটে বর্ণন করিয়া সেই

বিশ্বপাতা বিশ্বনিয়ন্তাকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

নীরদ বাবুর মুখে সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেরই বিস্ময় সঞ্চার হইল। সুরেন্দ্রনাথ নীরদ বাবুকে আর ভাড়াটিয়া বাটীতে যাইতে দিলেন না। নরেন্দ্রবাবুর অনুমতি লইয়া নীরদবাবুকে পুত্রকলত্র সহ আপনার বাটীতেই রাখিলেন। হীরার মা ও অন্যান্য ভৃত্যেরা ভাড়াটিয়া বাটী হইতে বসন্ত-লতার যাবতীয় দ্রব্যাদি আনয়ন করিল। নরেন্দ্রবাবু সে দিন প্রিয়তমা শশীমুখীকে লইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই সুরেন্দ্র বাবুর বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে নীরদ বাবুকে এবং বসন্ত-লতাকেও আপনাদিগের বাটীতে লইয়া যাইতেন। এইরূপে শুভমিলন হইলে আনন্দে নির্ব্বিঘ্নে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

উপসংহার।

ফুল ফুটিল।

এত আনন্দ, এত সুখের কোলাহল, তথাপি সুরেন্দ্রের মন যেন সর্ব্বদাই চঞ্চল—সর্ব্বদাই চিন্তিত! ইহার কারণ কি?—কারণ আছে, কারণ না থাকিলে তাদৃশ বিচক্ষণ বুদ্ধিমানের চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না। সরোজিনীর ভাবনাই তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্যের একমাত্র কারণ। কিরূপে—কতদিনে নলিনীর হস্তে সরোজিনীকে অর্পণ করিবেন, কবে

নলিনীকে সরোজিনীর পতিত্বে বরণ করিয়া সুখী হইবেন, এই চিন্তাই তাঁহার হৃদয়ে অহর্নিশি জাগরূক রহিয়াছে। তিনি পূর্ব্বে সংকল্প করিয়াছিলেন,——পিতার নিকটেও বলিয়াছিলেন যে, অগ্রে নলিনীর অভিপ্রায় জানিয়া বসন্ত-লতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিবেন। এ যাবৎ বসন্ত-লতার নিকট এ কথা উত্থাপন করেন নাই বটে, কিন্তু নলিনীর অনুরাগ জানিতে পারিয়াছেন, পাঠক মহাশয়-দিগকেও সে কথা পূর্ব্বে অবগত করাইয়াছি। এখন আর বসন্ত-লতার মতের জন্য কোন আশঙ্কা নাই। নীরদবাবু ও বসন্ত-লতা সরোজিনীকে পুত্রবধূ পাইলে যে চিরসুখী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কথোপকথনচ্ছলে তাঁহাদিগের নিকট সুরেন্দ্রবাবু এ কথা তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া মুক্তকণ্ঠে সম্মতিদান করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু আর কালবিলম্ব না করিয়া, সমস্ত ঘটনা প্রকাশ পূর্ব্বক পিতামাতাকে অবিলম্বে কলিকাতায় আসিতে পত্র লিখিলেন।

একদিন সুরেন্দ্রবাবু ও নলিনী বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, ইত্যবসরে সরোজিনী একখানি পুস্তক হাতে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। তখন সুরেন্দ্রনাথ নলিনীর উপর সরোজিনীর পড়া বলিয়া দিবার ভার দিয়া, অন্য কার্য্যচ্ছলে অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

সরোজিনীর পড়া যত হউক আর না হউক, নলিনীর রূপ দেখিয়া মনপ্রাণ শীতল করিবে, ইহাই তাহার একান্ত বাসনা। সে নলিনীর সহিত কথোপকথন করিতেছে, ইত্যবসরে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজ! তুমি আমায় ভালবাস?"

সরোজিনী যেন শুনিয়াও শুনিল না;—জিজ্ঞাসা করিল, "আজি কোন্ খানটা পড়া হবে?"

নলিনী বলিল, "আজি তোমার পড়া সাঙ্গ হবে।"

নলিনী যে তামাসা করিতেছে, বসন্ত-লতা তাহা বুঝিতে পারিল। এখন আর সে নলিনীকে ছোট-দাদা বলিয়া সম্বোধন করে না। সে বলিল, "আমার ত আর পড়্‌বার জন্য আসা নয়, নির্জ্জনে তোমাকে দেখ্‌বো, তোমার মধুময় কথা শুন্‌বো, এই জন্যই আসি।"

আবার নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজ! সত্য বল দেখি, তুমি কি আমাকে ভালবাস?"

হাস্য করিয়া সরোজিনী উত্তর করিল, "তা না বাস্‌লে আস্‌বো কেন?"

নলিনী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন এত ভাল বাস?"

"তা আমি জানি না।"

"দেখ, তুমি আমায় ভাল বেসো না।"

এই কথা শুনিয়া সরোজিনী যেন চমকিয়া উঠিল;—কহিল, "জীবন থাকৃতে?"

"বল কি সরোজ? সে কি ভাল?"

"মন্দ কিসে?"

"তোমার পিতা তোমাকে কার হাতে দিবেন, তার ত স্থিরতা নাই। তাই বলি, তুমি আমাকে ভাল বেসো না।"

গদ্গদস্বরে সরোজিনী বলিয়া উঠিল, "আমি তোমারি! বিধাতা তোমারই হস্তে আমাকে সমর্পণ কোর্‌বেন।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথ উ
াস্থিত হইয়া বলিলেন, "সরোজ! বাবা ও মা এসেছে
ৎক্ষণাৎ সরোজিনী সহোদরের সহিত সদর দরজায় উ
ত হইল। রাধানাথ বাবু সস্ত্রীক গাড়ি হইতে অবত
রিয়া, সরোজিনীকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে ঘন
থচুম্বন করিতে লাগিলেন। সকলে অন্তঃপুরে প্রে
রিলে, নীরদ বাবুর সহিত রাধানাথের পরিচয় ও ি
াষণাদি হইল। সকলেই আনন্দে আনন্দে দিবাবিভাব
তিবাহিত করিলেন।

শুভদিন স্থির হইল। নানাস্থান হইতে আত্মীয়কুটুম্ব
আগমন করিল। নলিনীর সহিত সরোজিনীর শু
রিণয়! আনন্দের অবধি নাই। নরেন্দ্রবাবু সমস্ত কর্ত্তব্যে
র প্রাপ্ত হইলেন। অন্তঃপুরে [illegible]
ীর উপর ন্যস্ত হইল। রাজনগর হইতে প্রধান প্রধা
্রান্ত ব্যক্তিবর্গ আগমন করিলেন। নীরদচরণ বাবু
দিকে আনিতেও ভুলিলেন না। যথাসময়ে উপস্থি
ইলে শুভক্ষণে শুভলগ্নে রাধানাথ বাবু নলিনীর ক
রোজিনীকে সম্প্রদান করিলেন। এতদিনের পর সরোজ
ল ফুটিল!

যথাকালে সমস্ত কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে আত্মীয়স্বজন
। স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। নবদম্পতী হরগৌরীর ন
বিত্রমনে দিনযাপন করিতে লাগিল।

পাঠক মহাশয়গণ! এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে যাব
টনাই যথাযথ বর্ণিত হইল। এক্ষণে সরোজিনীর এ
কুমার জন্মিলেই—নবকুমারের মুখপদ্ম দেখিলেই আপন
য় প্রীতিলাভ করিতেন সত্য, কিন্তু সে বিষয়ে অ

হইলাম। তবে আশা থাকা ভাল, আশা রাখুন, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, অবশ্যই নবদম্পতী নবশিশু পাইয়া কালে অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিতে পারিবেন।

সম্পূর্ণ।